তথ্য অধিকার আইন

কাঠামো ও প্রয়োগ

ফারহানা আফরোজ

তথ্য অধিকার আইন

কাঠামো ও প্রয়োগ

ফারহানা আফরোজ

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

PROGATI
Promoting governance, accountability, transparency and integrity

MRDI

বিষয়সূচি

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় ৩
তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন

দ্বিতীয় অধ্যায় ৯
তথ্য অধিকার আইন
কর্তৃপক্ষ ১১
তথ্য ও তথ্য অধিকার ১৪
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৭
আপিল কর্তৃপক্ষ ১৯
তথ্য কমিশন ২০
তথ্য অধিকার আইনের চর্চা
তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ২৪
আপিল প্রক্রিয়া ২৮
অভিযোগ প্রক্রিয়া ৩১

তৃতীয় অধ্যায় ৩৫
তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগিক দিক
সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন ৩৭
বেসরকারি সংস্থার সামাজিক নিরীক্ষায় তথ্য অধিকার আইন ৪৩
প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা ৪৯
সুপারিশ ও মন্তব্য ৫১

চতুর্থ অধ্যায় ৫৩
নতুন প্রাপ্তি : জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

পঞ্চম অধ্যায় ৫৭
সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

পরিশিষ্ট ৭৫
তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কিছু প্রতিবেদন ৭৭
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কিছু আপিল কর্তৃপক্ষের তালিকা ৭৯
কর্মসূচি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের তালিকা ৮২
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ ৮৪
তথ্যসূত্র ৯২

ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় এই আইন। এই আইন দ্বারা একদিকে নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষকেও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের বিধান দেয়া হয়েছে। আইনটির সুস্থ চর্চা সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে।

এই আইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে আপিলের সুযোগ এবং সর্বোপরি আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বাধীন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন-অবস্থা পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই জানা যাবে আইনটি প্রণয়ণের উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হওয়ার পথে রয়েছে।

আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী স্টেকহোল্ডার হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও বা সিএসও) এবং সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) ইউএসএআইডি প্রগতির সহযোগিতায় তিন বছর ধরে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা দেশে এনজিও-প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এই আইনের অধীনে একদিকে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদিকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তথ্য চাহিদাকারীও। প্রগতির সহযোগী এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবা খাত পর্যবেক্ষণ করতে নাগরিক পরিবীক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সামাজিক নিরীক্ষাকাজ পরিচালনা করছে। এনজিওরা একদিকে যেমন এই আইনটি ব্যবহার করে সেবা খাত পরিবীক্ষণের কাজটি করতে পারবে, তেমনই নিজ নিজ এলাকায় আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারবে।

অপরদিকে সাংবাদিকেরা সমাজের অগ্রসর মানুষ হিসেবে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি আয়-ব্যয়, সিদ্ধান্ত, প্রকল্প-সম্পর্কিত সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং জনগণের উদ্দেশে গণমাধ্যমে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা প্রকাশ করবেন।

এই উদ্যোগের অধীনে সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধিদের তথ্য অধিকার আইনের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি এর চর্চার প্রতি বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রণয়নের তৃতীয়

বছরে আইনটি ব্যবহারের পর কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতার আলোকেই এ বইটি রচনার প্রয়াস। বইটিতে মূলত তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ পর্যালোচনা করা হয়েছে, আইনটি ব্যবহারকারী সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধিদের এবং সহায়তাকারী হিসেবে প্রশিক্ষকদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ ও সুপারিশগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রকাশনাটিতে সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা-সংবলিত একটি অধ্যায় রয়েছে কারণ তারা ইতিমধ্যেই অভিযোগ পর্যায় পর্যন্ত সম্পন্ন করেছে, অপরদিকে এনজিও-প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আইন চর্চার পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করতে পারেননি। আশা করি, তাদের অভিজ্ঞতাও একটি ভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হবে। বইটি থেকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারী ও তথ্য প্রদানকারী—উভয়ই ধারণাগত বিষয়ে কিছু দিক-নির্দেশনা পাবেন, যা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া।

এমআরডিআই-এর ম্যানেজার, প্রোগ্রাম এ্যান্ড কমিউনিকেশন ফারহানা আফরোজ সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত এই বইটি রচনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এজন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

পুরো বইটি পড়ে সার্বিক পরামর্শ দিয়েছেন তথ্য কমিশনের প্রথম এবং অতিসম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং সাংবাদিকের অংশটি দেখেছেন এসোসিয়েটেড প্রেসের ব্যুরো প্রধান ফরিদ হোসেন। বইয়ে বর্ণিত সব অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংবাদিক ও এনজিও-প্রতিনিধিরা। সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

সাংবাদিক ও এনজিও প্রতিনিধিসহ সব তথ্য অধিকার আইন অনুশীলনকারী সবার জন্য বইটি প্রকাশের সুযোগ দেয়ার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ইউএসএআইডি প্রগতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

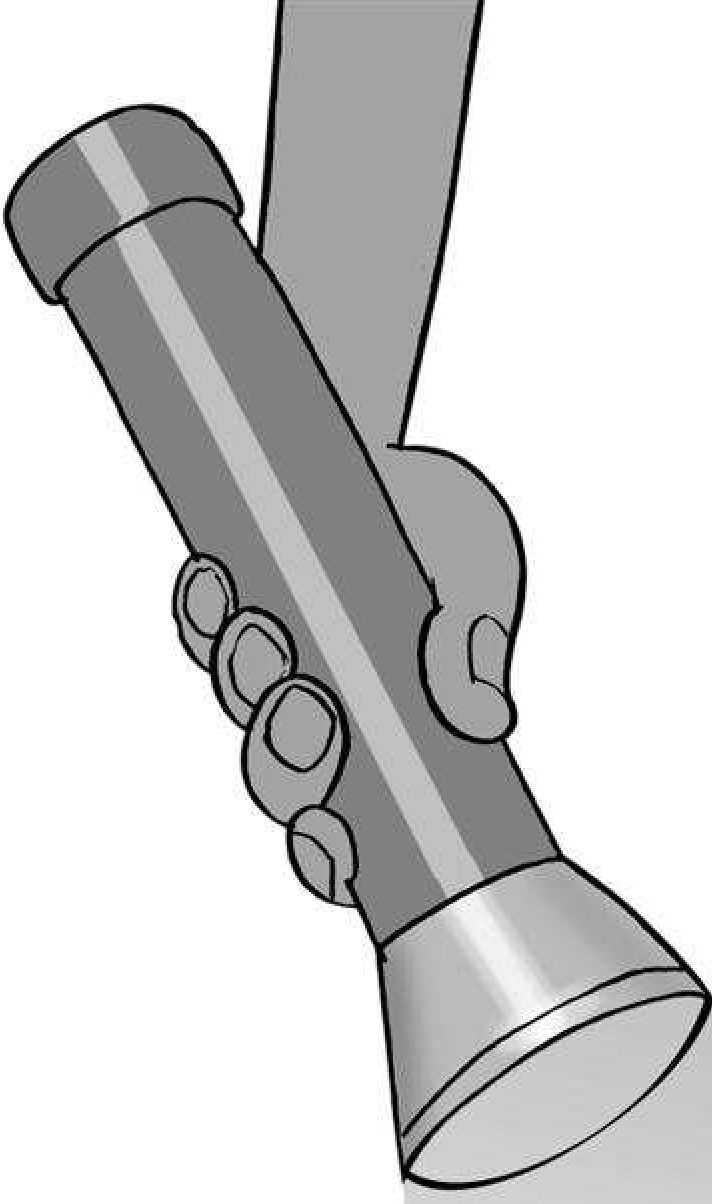

প্রথম অধ্যায়

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন

রাষ্ট্রের জনগণের সম্পদ কাজে লাগিয়ে জনগণের উন্নতি বা মঙ্গলের জন্য কাজ করে সরকার। নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক তথ্যগুলো নাগরিকের জানার আওতায় না থাকলে নাগরিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বা বাধাহীনভাবে অংশ নিতে পারে না, আর সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৪ অনুযায়ী 'কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।'

গণতন্ত্র চর্চার মূল কথা হলো—জনগণের অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতাকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৭(ক) ধারায় বলা আছে, 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। তাই সরকারের কাছে যেসব তথ্য আছে, সেটার মালিকও জনগণ। অর্থাৎ তথ্য শুধু সরকারের সম্পত্তি নয়; সরকার তার কাজকর্মের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করে বা তৈরি করে, সেই তথ্য জানার অধিকারও জনগণের রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনা অংশে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সংবিধানে বিবৃত মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার অংশের যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার অর্জনে সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও। এসব সংস্থা জনগণের কল্যাণে সরকারের ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।[১] অর্থাৎ যে অর্থে জনগণের কল্যাণ নিহিত আছে, সেই অর্থে স্বচ্ছতা সম্পর্কে জানার অধিকার জনগণের আছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সব কার্যক্রম, নীতি, সিদ্ধান্ত, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

তথ্য অধিকারের মূলনীতি হলো—

১. সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশ;
২. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ;
৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
৪. প্রকাশযোগ্য নয়, এমন তথ্যের আওতা সীমিত রাখা;
৫. তথ্যে প্রবেশগম্যতাকে সহজ করা;
৬. সীমিত যৌক্তিক তথ্যমূল্য বা বিনা মূল্যে তথ্য প্রদান ইত্যাদি।

এসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই আমাদের তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। নাগরিক হিসেবে যেসব সেবা, অধিকার ও সুবিধা পাওয়া উচিত, সেগুলো যেন সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিতে বাধ্য থাকে, এটা নিশ্চিত করার উদ্যোগ হিসেবে তথ্য অধিকারকে চর্চা করতে হবে।

---

[১]এনজিও-বিষয়ক ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৮৫৩৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ১৯৯০ থেকে জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বিদেশি দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত ৩৮০,১২১,০৯৪,২৩৪.৭৯ টাকা অর্থ ছাড় করেছে ।

তথ্য অধিকার আইনের কিছু বিশেষ প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন—

প্রথমত, তথ্য অধিকার আইন নিজে কোনো সমাধান নয়, এটা একটি পদক্ষেপ—উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আপনি হয়তো নতুন বিদ্যুৎ অথবা ওয়াসা-সংযোগ পাবেন না। কিন্তু এটা জানতে পারবেন, আপনার বাসায় বিদ্যুৎ বা ওয়াসা লাইন দেয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে; কিংবা বিদ্যুৎ লাইন চাওয়ার পর এর পরিপ্রেক্ষিতে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; কবে এই সংযোগ পাওয়া যাবে অথবা এ দেরির জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি না।

তথ্য অধিকার আইন চর্চা করে তথ্য চাইলে নাগরিকেরা দুভাবে কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনছে। প্রথমত, সংস্থাটি যে মূলত নাগরিককে সেবা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত, তা নিজে উপলব্ধি করতে পারবে এবং কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগেই তথ্য প্রদানে উৎসাহী হবে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য অধিকার আইন সমাধান তুলে ধরার মাধ্যম হতে পারে—নাগরিক হিসেবে আমরা একটি সমাজে বা এলাকায় বাস করি, তাই এই আইন ব্যবহার করে তথ্য জানতে চাওয়ার মাধ্যমে কিছু সমস্যার সমাধানকল্পে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব, যেমন—

- একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা কত থাকার কথা এবং কতজন আছে;
- সরকারি স্কুলগুলোতে প্রতিদিন শিক্ষকের উপস্থিতির হার কত;
- কারাগারে বন্দীর সংখ্যা কত থাকার কথা এবং এর বিপরীতে কতজন বন্দী আছে।

তৃতীয়ত, তথ্য অধিকার আইন সামষ্টিক স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে—এমন হতে পারে, নাগরিকের একার পক্ষে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর বা কঠিন হয়ে পড়েছে। তখন তিনি অন্য কোনো সহায়তাকারীর সাহায্য নিয়ে তথ্য চাইতে পারেন। আমাদের দেশে প্রান্তিক গোষ্ঠী কোনো বেসরকারি সংগঠন বা নাগরিক সমাজের সহায়তায় তথ্য চাইতে পারে। নাগরিক নিজে তার ইচ্ছে অনুযায়ী যেকোনো সহায়তাকারীকে সঙ্গে নিয়ে তথ্য চাইতে পারেন।

আবার নাগরিক সমাজ বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমাজবিচ্ছিন্ন বা অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বা তাদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তথ্য জানতে চাইতে পারে। দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠী সংগঠিত হলেও তাদের পক্ষে এককভাবে এই অধিকার আদায় করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে দলিত/হরিজন জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। যেমন, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত। অথচ এর পরও এই জনগোষ্ঠীর অনেকে সাধারণ/সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় না। জাতভেদের কারণে তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। অনেক সময় ভর্তি হতে পারলেও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দলিত হরিজন জনগোষ্ঠীর কোনো প্রতিনিধি জানতে চাইতে পারেন, কেন তাদের সন্তান সরকারি/বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। কেন এবং

কারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এখানে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ওই হরিজন জনগোষ্ঠী বা দলিত/হরিজন জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন তাদের পক্ষ হয়ে প্রতিনিধির মাধ্যমে তথ্য চাইতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের শক্তি

- সংসদ যে তথ্য পাবে, জনগণও সে তথ্য পাবে—তথ্য অধিকার আইনের অধীনে একজন নাগরিক সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখে, যা সংসদ পেতে পারে। এমনকি যেসব তথ্য প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা আছে, সেই তথ্য যদি সংসদে দেওয়া হয়, তবে নাগরিক তা পাবে। যেমন : পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির প্রমাণ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক যে প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে দিয়েছে, তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। যদি এটি সংসদে উত্থাপন করা হয়, তাহলে জনগণও এই তথ্য পাবে।

- ক্ষেত্রমতে বিনা মূল্যে তথ্য পাওয়া যাবে—তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮(৫)-এ বলা হয়েছে 'সরকার ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।' তবে তথ্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে।

- আমি কেন তথ্য চাচ্ছি, এর ব্যাখ্যার দরকার নেই—একজন নাগরিক যেকোনো তথ্য চাইতে পারেন। এ জন্য তাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে না যে তিনি কেন এই তথ্য চাইছেন।

- প্রকাশযোগ্য ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য চাহিত কোনো আবেদনই সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না—ধারা-৭-এ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের সঙ্গে চাহিত তথ্য সম্পর্কযুক্ত হলেও কোনো আবেদন সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না, যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে আলাদা করে প্রকাশ করা যাবে ততটা অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে।

আর এসব বিবেচনায় তথ্য অধিকার আইন প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আইন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য অধিকার আইন

(ক) 'কর্তৃপক্ষ' যিনি তথ্যের ধারক ও বাহক

সব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষ।[২]

আইন অনুযায়ী 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ—

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা। যেমন—নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮), মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭), সরকারি কর্মকমিশন (অনুচ্ছেদ ১৩৭)।

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয় । যেমন—সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও তদধীন পরিচালিত সব বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়গুলো।

(ই) কোনো আইন দ্বারা বা এর অধীন গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন—বাংলাদেশ ব্যাংক (পিও নং ১২৭, ১৯৭২), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন), ইউনিয়ন পরিষদ (স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯) ইত্যাদি।

(ঈ) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন—বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন)

(উ) বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন—এমআরডিআইসহ অন্যান্য এনজিও।

(ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। যেমন—বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদারগণ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন [এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪০ নং আইন)] প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(ঋ) সরকার কর্তৃক, সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। এখনো নির্ধারিত হয়নি, তবে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে নতুন কোনো সংস্থাকে কর্তৃপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে।

---

[২] ধারা ২(খ)

আইনে 'কর্তৃপক্ষ'র সংজ্ঞা ব্যাপক; মূলত এখানে প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠান, যারাই জনগণের অর্থ ব্যবহার করছে, সবাইকে এর আওতায় আনা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক সরকারি-বেসরকারি এসব কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য পেতে পারেন। অর্থাৎ— মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, এমপিওভুক্ত স্কুল ও কলেজ, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, সরকারি অর্থে পরিচালিত যেকোনো প্রকল্প কার্যালয়, বেসরকারি সংস্থার এনজিওর প্রধান, শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ের কাছে নাগরিক তথ্য চাইতে পারেন।

ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে

এই আইনে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রেজিস্টার্ড, এমন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের তথ্যের জন্য আবেদন করা যাবে। একটি উদাহরণ হতে পারে— বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সব সরকারি খরচের অডিট করে থাকে, এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)। এখন আমাদের দেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন। অর্থাৎ, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নাগরিক তাদের কাছে তথ্য জানতে পারবে না। কিন্তু এ কোম্পানিগুলো বিটিআরসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে যেকোনো নাগরিক বিটিআরসির অডিট রিপোর্টে যেকোনো মোবাইল ফোন কোম্পানি-সম্পর্কিত অডিট আপত্তিগুলো দেখতে বা জানতে চাইতে পারেন।

একইভাবে গ্রামাঞ্চলে এখন মাল্টিপারপাস সোসাইটি নামের প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছেমতো ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। কোনো নাগরিক এসব সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা চাইতেই পারেন।

কিছু সংস্থা যারা এই আইনের আওতায় পড়ে না

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা-কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে[৩] এই আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যদিও, এসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি বা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনবিষয়ক তথ্য নাগরিককে প্রদানের বিষয়ে আইনের নির্দেশনা রয়েছে। দুর্নীতি বা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনবিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ পেলে এসব প্রতিষ্ঠানকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন নিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে সরবরাহের নির্দেশ রয়েছে।

---

[৩] তফসিল (ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য)

কিছু সংস্থা যারা এই আইনের আওতায় পড়ে না[৪]

১. জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)

২. ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)

৩. প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ

৪. ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ

৫. স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল

৭. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ

৮. র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) গোয়েন্দা সেল

তবে এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে, সে ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।[৫]

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

- ক্যাটালগ ও সূচিপত্র আকারে তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করা।
- তথ্য সংরক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি উন্নয়ন করবে।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন করবে।[৬]
- ক্রমান্বয়ে তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
- প্রতিটি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকতে হবে।
- মান অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও অনুলিপি তৈরি করতে হবে।
- প্রতিটি কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে সব তথ্য কম্পিউটারাইজড করবে এবং ওই তথ্যে সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করবে।
- প্রতিটি কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করবে।

ইউএসএআইডি প্রগতি ও এমআরডিআই ২০১২ সালে ৩৯টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ তথ্য অবমুক্তকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এই আইনের বিধানগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

---

৪ তফসিল (ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য)

৫ ধারা ৩২ (২)

৬ তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০; ধারা ১৩

(খ) তথ্য ও তথ্য অধিকার

'তথ্য অধিকার। —এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।' (ধারা-৪)

তথ্য অধিকার আইন জনগণকে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ব্যাপক পরিসরে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য বলতে যেকোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে নথির নোট-অংশকে তথ্যের আওতাভুক্ত করা হয়নি।[৭]

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নাগরিকের তথ্যে পরিদর্শনের অধিকার রয়েছে[৮]

তথ্য চাহিদাকারী প্রয়োজনে কোনো কাজ, দলিল-দস্তাবেজ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। যেমন, সিরাজগঞ্জের শহর রক্ষা বাঁধটির বর্তমান অবস্থা এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে এ-সংক্রান্ত সব ফাইলপত্র পরিদর্শন করে যেকোনো নাগরিক মিলিয়ে দেখতে পারবেন—সরকারি নথিতে কী কাজের বিবরণ রয়েছে এবং বাস্তব অর্থে কী অগ্রগতি হয়েছে। এমনকি এসব থেকে প্রয়োজনীয় অংশের ফটোকপিও নাগরিক পেতে পারেন।

তথ্যের অনুমোদিত কপি পাওয়ার অধিকার রয়েছে

বিভিন্ন সূত্র থেকে অনেক সময় অনেক অনিয়ম বা দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়, যা অনেক সময় প্রমাণসাপেক্ষ হয় না। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে উল্লিখিত তথ্যের কপি পাওয়া সম্ভব, যেখানে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়ন থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোতাবেক বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচির আওতায় জেলা পরিষদে যে খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, ওই পত্র অনুযায়ী উপজেলাভিত্তিক কী পরিমাণ বিতরণ হয়েছে তার কপি পাওয়া সম্ভব এবং তার সঙ্গে প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে দেখা যায়।

কোনো নকশা বা মানচিত্র পাওয়ার অধিকার রয়েছে

কোনো প্রকল্পের নকশা বা মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি পাওয়ার আইনগত অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। যেমন, যেকোনো নাগরিক তার এলাকার খাসজমির নকশা দেখতে পারেন এবং যারা জমি দখল করে আছেন, খাসজমি বরাদ্দের নীতির সঙ্গে তার অবস্থা মিলিয়ে দেখতে পারেন।

যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদিতেও নাগরিকের প্রবেশাধিকার রয়েছে

তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়নের বিষয়টি বিবেচনা করে আইনে যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদিতেও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের উপকারভোগীদের তালিকার

---

[৭] ধারা ২(খ)(চ)

[৮] ধারা ৮(২)(ঈ)

কপি, নকশার কপি সিডি, ডিভিডিতে ও ভিডিওচিত্রের কপি নাগরিক পেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রবিধানমালায়[৯] তথ্য-ব্যবস্থাপনায় ক্রমান্বয়ে তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও তার মতো করে তথ্য পেতে পারেন[১০]

ইন্দ্রিয়প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো তথ্যের রেকর্ড, তার অংশবিশেষ এবং পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার কথা রাখা হয়েছে।

যেসব তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে[১১]

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশকে নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। এটি আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক তথ্য আছে, যা নাগরিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য তথ্য আবেদন নয় বরং কর্তৃপক্ষ নাগরিকের জন্য তা উন্মুক্ত রাখবে।

স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের অর্থ হলো অনুরোধ না করা সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় তথ্য প্রকাশ করা। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততার মাধ্যমে সংস্থার প্রতি নাগরিকের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করার একটি পথ, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি সূচক।

নিচের তথ্যগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনে বিধান রয়েছে, যা জনগণের অংশগ্রহণ ও তাঁদের জন্য নিয়োজিত সেবাদানকাজ তদারকির জন্য প্রয়োজনীয়—

- কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম, সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট সব তথ্য সূচিবদ্ধ ও সহজলভ্য করে প্রকাশ ও প্রচার;
- তথ্য প্রকাশে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো বিষয় গোপন বা তথ্যে প্রবেশাধিকারকে সীমিত করতে পারবে না।

প্রতিটি কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, যাতে নিচের তথ্যগুলো সন্নিবেশিত হবে—

- কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ ও দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা, যেমন—
  - ✓ *উপবৃত্তি প্রদানের তালিকা চূড়ান্তকরণের মিটিং এর কার্যবিবরনী*
  - ✓ *সদর হাসপাতালে কতজন ডাক্তার, কর্মকর্তা, কর্মচারী থাকার কথা, তাদের দায়িত্ব*
  - ✓ *জেলা প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কমিটি সদস্যের নাম*
  - ✓ *ক্রয় কমিটির সদস্যদের নাম*
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরিত সংশ্লিষ্ট আইনকানুন, বিধিবিধান, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা ও সহায়িকা, যেমন—
  - ✓ *ভিজিডি কর্মসূচি/বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমে নাম অন্তর্ভুক্ত করার নীতিমালা*

---

[৯] তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১২ ধারা ১৪(১)
[১০] ধারা ৯(১০)
[১১] ধারা ৬

- তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস।
- নাগরিক কীভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স, পারমিট, সাহায্য, বরাদ্দ, অনুমোদন বা অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে এবং এর জন্য কী কী শর্ত আছে তার বর্ণনা, যেমন—
  - ✓ *বিআরটিএ থেকে লাইসেন্স পাওয়ার শর্তাবলি*
- তথ্য প্রদানের জন্য সংস্থায় নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, যোগাযোগের ঠিকানা, প্রযোজ্য হলে মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ঠিকানা।
- প্রস্তুতকৃত এ প্রতিবেদন জনগণ যাতে বিনা মূল্যে দেখার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করে বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, এটি অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পক্ষে যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তিগুলো বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা অনুসরণ করতে হবে।

এমন কিছু পরিস্থিতি রয়েছে, যেখানে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকাশে বাধ্য নয়

১. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, পররাষ্ট্রনীতি এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে, এমন তথ্য—

- সামরিক বাহিনীর সমরাস্ত্র মজুদসংক্রান্ত তথ্যাদি;
- সীমান্ত নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যাদি।

২. আর্থিক, বাণিজ্যিক ও কৌশলগত কারণে সংরক্ষিত তথ্য—

- আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট বা আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন-সংক্রান্ত অগ্রিম তথ্য;
- মুদ্রা বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত অগ্রিম তথ্য;
- ব্যাংকসহ অর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি-সংক্রান্ত অগ্রিম তথ্য ইত্যাদি।

৩. আইনগত বা বিচার বিভাগীয় তদন্ত বাধাগ্রস্ত হতে পারে, এরূপ তথ্যাদি—

- তদন্তাধীন কোনো বিষয় যা প্রকাশ করলে তদন্তে বাধা হতে পারে;
- তদন্ত-প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেপ্তার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে।

৪. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য—

- চিকিৎসকের কাছে রোগীর তথ্য;

* উকিলের কাছে তার মক্কেলের তথ্য;
* ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব, ট্যাক্স ফাইল ইত্যাদি।

৫. জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য—

* পরীক্ষার প্রশ্নপত্র;
* নম্বরপত্র (আগাম) ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য, এ পরিস্থিতিগুলো চূড়ান্ত নয় এ কারণেই—

'ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।' ধারা ৯(৯)।

উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা-সম্পর্কিত এমন তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকারকে সীমিত করা হয়েছে। তথাপি যেকোনো কর প্রদানকারী নাগরিকের এতটুকু জানার অধিকার থাকতে পারে, রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করছে; কী ধরনের কেনাকাটা করছে বা রাষ্ট্রের জলসীমা, তেল, গ্যাস কীভাবে, কী চুক্তির অধীনে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে তা জানার। কারণ সর্বোচ্চ জনস্বার্থের বিবেচনায় কোনো তথ্যই গোপন নয়।

নোট : বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যগুলোর পরিষ্কার ব্যাখ্যা সব কর্তৃপক্ষের থাকা প্রয়োজন। তথ্য কমিশন এ ধরনের পদক্ষেপ নেবে—এ সুপারিশ এসেছে এ উদ্যোগের আওতাধীন সব অংশগ্রহণকারীর পক্ষ থেকে।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে নিশ্চিত করতে এই আইনে একজন সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে—তিনি 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা'।[১২]

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতিটি কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্তে প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য (কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে) একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন জারির ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ করবে। আইন নতুনভাবে নিয়োগের কথা বলছে না, এটি মূলত বিদ্যমান কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একজনকে তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন করতে হবে। প্রতিটি কর্তৃপক্ষ নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার নাম, ঠিকানা ও বিবরণসহ নিয়োগ দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে জানাবে।[১৩]

---

[১২] ধারা ১০

[১৩] সারা দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ২২০০০ ইউনিট রয়েছে। তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ অনুযায়ী সরকারি দপ্তরে ৭৯০৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তারা পেয়েছেন। আর বেসরকারি কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও কম, ৫৭১টি সংস্থার ২৪৭০ জন। এনজিও-বিষয়ক ব্যুরোর তথ্যমতে, দেশে শুধু এনজিও ব্যুরোতে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থার সংখ্যা ২১২২ (এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত)। সরকারি-বেসরকারি অফিসে সর্বমোট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১০৩৭৪

তথ্য প্রদান ইউনিট : আইন অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ একেকটি তথ্য প্রদান ইউনিট। তবে অনেক তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ একাধিক কার্যালয় থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই কর্তৃপক্ষের প্রতিটি কার্যালয় একটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যেকোনো কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হলে তিনি সহযোগিতা প্রদান না করলে দায়দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন।

আইনে নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব[১৪]

- তথ্য প্রাপ্তির লিখিত আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকার এবং ই-মেইলে পাঠানো আবেদন ওই দিনেই প্রাপ্ত মর্মে গণ্য করতে হবে।
- অনুরোধ পাওয়ার তারিখ থেকে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে এই আইনের বিধানের আলোকে প্রার্থিত তথ্য প্রদান করতে হবে।
- তথ্যের সঙ্গে মূল্য সংশ্লিষ্ট হলে আবেদন পাওয়ার পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাতে হবে।
- আবেদনকৃত তথ্য প্রদানে অপারগ হলে, কারণ উল্লেখ করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আাবেদনকারীকে জানাতে হবে।
- তৃতীয় পক্ষ সংশ্লিষ্ট তথ্য হলে তা যদি তৃতীয় পক্ষের গোপনীয় তথ্য হয়, সে ক্ষেত্রে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিক মতামত চেয়ে নোটিশ দিতে হবে।
- তথ্যের সঙ্গে অন্য পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে।
- জীবন, মৃত্যু, কারাগার থেকে মুক্তি-সম্পর্কিত তথ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রদান করতে হবে।
- ইন্দ্রিয়প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করতে হবে।
- তথ্য প্রদানের সময় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে'—এই মর্মে প্রত্যয়ন করে দাপ্তরিক সিল-স্বাক্ষর প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।[১৫]

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলাজনিত বিধান[১৬]

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি—

- কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া তথ্য প্রাপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন;
- আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে বা সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হন;
- অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোনো অনুরোধ বা আপিল প্রত্যাখ্যান করেন;

---

[১৪] ধারা ৯

[১৫] তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ ধারা ৩ (৫)

[১৬] ধারা ২৭

- ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেন;
- তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন ইত্যাদি।

উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এ ধরনের কাজের তারিখ থেকে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এ ধরনের কাজকে অসদাচরণ গণ্য করা হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশও দিতে পারবেন।

(ঘ) আপিল কর্তৃপক্ষ

"আপিল কর্তৃপক্ষ[১৭]" অর্থ–

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

এই আইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পরবর্তী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো আপিল কর্তৃপক্ষ। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে অনেক সময় সময়মতো তথ্য নাও পেতে পারেন—তখন সংক্ষুব্ধ নাগরিক যার কাছে গিয়ে প্রতিকার চাইতে পারেন, তাকে বলা হয় আপিল কর্তৃপক্ষ।

নাগরিক কখন আপিল করবেন—

- আইনে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তথ্য না পেলে;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে বা প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে;
- তথ্য দেয়া হবে না—এটি সময়মতো না জানালে;
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেসব তথ্য দেয়ার কথা—তা না দিলে ইত্যাদি।

উপরিউক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল আবেদন করা যাবে। তথ্য অধিকার আইন অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদনটি করা এবং পরবর্তী সময়ে সংক্ষুব্ধ হলে সঠিক কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল আবেদন করা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক তথ্য আবেদনের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আপিল পর্যন্ত যেতে হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক জবাব পাওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন।

---

[১৭] ধারা ২ (ক)

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

একজন সাংবাদিক আরও দুটি তথ্যসহ যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ অংশের ড্রেজিং বাবদ ব্যয় ও উত্তোলনকৃত বিল, বকেয়া বিল সম্পর্কে বিস্তারিত ফাইল দেখতে ও ফটোকপি পেতে চেয়েছেন পাউবো (বিআরই বিভাগ), সিরাজগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে। ২০ দিন পর আপিল করেন তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো (বিআরই বিভাগ), সিরাজগঞ্জ বরাবর। তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই আপিল কর্তৃপক্ষ সব তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু কার্যালয় পরিদর্শন করে এজাতীয় কোনো তথ্যসংক্রান্ত ফাইলই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেখাতে পারেননি।

আপিল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব [১৮]

আপিল আবেদন পাওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে এবং নির্দেশ দেয়ার আগে—

- সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শপথের ভিত্তিতে বা হলফনামার ভিত্তিতে মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন;
- ডকুমেন্টস, পাবলিক রেকর্ডস বা এর কপিগুলো পর্যালোচনা বা প্রয়োজনে পরিদর্শন করবেন;
- প্রয়োজনবোধে ঘটনা তদন্ত করবেন;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার শুনানি গ্রহণ করবেন;
- আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান অথবা আবেদনটি গ্রহণযোগ্য না হলে খারিজ করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করবেন।

(ঙ) তথ্য কমিশন

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্যে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গত ১ জুলাই ২০০৯ সালে। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা।

তথ্য কমিশন মূলত যেকোনো নাগরিকের কাছ থেকে তথ্য না পাওয়া-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। তথ্য অধিকার আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তথ্য কমিশনেও একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন এবং তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন প্রধান তথ্য কমিশনার।

---

[১৮] তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত), বিধিমালা, ২০০৯, ধারা ৬

নাগরিক কখন তথ্য কমিশনে অভিযোগ করবেন

- কোনো কর্তৃপক্ষ যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করে থাকে;
- তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করলে;
- কোনো তথ্যচাহিদা প্রত্যাখ্যান করলে;
- তথ্যের জন্য অনুরোধ করে আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো জবাব বা তথ্যপ্রাপ্ত না হলে;
- কোনো তথ্যের অযৌক্তিক অঙ্কের মূল্য দাবি করলে বা তা প্রদানে বাধ্য করলে;
- অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করলে ইত্যাদি।

তথ্য কমিশনের ক্ষমতা

- আধাবিচারিক (quasi-judicial);[১৯]
- অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিস্পত্তি;
- স্বপ্রণোদিত হয়ে বা কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে;
- কোনো ব্যক্তিকে ভ্রান্তভাবে অভিযোগে পক্ষ করা হলে কমিশন যাচাইপূর্বক তাকে বাদ দিতে পারবে;[২০]
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যেমন—
  - ✓ তথ্য কমিশনে হাজিরের জন্য সমন জারি;
  - ✓ তথ্য যাচাই পরিদর্শন;
  - ✓ হলফনামাসহ প্রমাণ;
  - ✓ কোনো অফিসের তথ্য/নথি আনতে পারবে;
  - ✓ সাক্ষী তলব করে সমন জারি ইত্যাদি।

তথ্য কমিশনের কার্যাবলি (ধারা-১৩)

কমিশনের প্রধান কাজ তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, তথ্য চাহিদাকারী নাগরিক, সরকার ও নাগরিক সমাজকে কেন্দ্র করে।

তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ-সংক্রান্ত

- ধারা ৭-এ উল্লিখিত তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষকে স্থগিতের বিষয়ে অনুমোদন প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

---

[১৯] A quasi-judicial body is an individual or organization which has powers resembling those of a court of law or judge and is able to remedy a situation or impose legal penalties on a person or organization.

[২০] তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তিসংক্রান্ত) প্রবিধানমালা ২০১১, ধারা ৪

- কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ;
- তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

তথ্য চাহিদাকারী-সংক্রান্ত

- নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;
- নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাগুলো চিহ্নিত করা।

তথ্য অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ-সংক্রান্ত

- তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান;
- চিহ্নিত সমস্যাগুলো যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান;
- তথ্য অধিকারবিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলগুলোর ওপর গবেষণা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান;
- নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার-সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সঙ্গে বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তা দূর করতে সরকার বা ক্ষেত্রমতো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

তথ্য প্রদান বিষয়ে শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে অনুরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোনো আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

অভিযোগ নিষ্পত্তি

- অভিযোগ পাওয়ার পর তা কমিশনের অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্টারে তারিখ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম, ঠিকানা এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ লিপিবদ্ধ করা।
- প্রধান তথ্য কমিশনার নিজে অভিযোগটি অনুসন্ধান করবেন বা তথ্য কমিশনারদের দায়িত্ব দেবেন।
- অভিযোগ অনুসন্ধান করে একটি কার্যপত্র তৈরি করে তথ্য কমিশনের সভায় উত্থাপিত করতে হবে এবং সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (অভিযোগকারী ও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে) তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সমন জারি করবেন।
- তথ্য কমিশনে শুনানির আয়োজন করবেন।
- অভিযোগ প্রমাণিত হলে জরিমানা ছাড়াও বিভাগীয় শাস্তির সুপারিশ করা যাবে।
- তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে, তবে সর্বোচ্চ ৭৫ দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশন প্রতিবছর ৩১ মার্চের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবে। সারা দেশে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন-পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনের ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, আপিল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়ের করা অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটির বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এবং তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কার-প্রস্তাব প্রভৃতি এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এ প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করে দেখলে সারা দেশের তথ্য অধিকারের চিত্র পেতে পারেন, যা এই আইন বাস্তবায়নে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একটি দিক-নির্দেশনা দেবে। তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত দুটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তথ্য কমিশনের ওয়েব ঠিকানায় (www.infocom.gov.bd) বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো পাওয়া যাবে।

তথ্য অধিকার আইনের চর্চা

(ক) তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ

তথ্য অধিকার আইন নাগরিককে সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সব তথ্যে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তথ্যে প্রবেশাধিকারের মধ্য দিয়ে নাগরিক হিসেবে তিনি কতটুকু অধিকার ভোগ করছেন, তা পরিমাপের একটি সুযোগ তৈরি হয়। অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণকে রাষ্ট্রীয় নীতি, সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি বাস্তবায়নে মতপ্রকাশ ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়িত করে, যা গণতন্ত্র চর্চার পথকে সুগম করে। বাড়ির সামনে রাস্তাটি মেরামতের খরচ, পরিকল্পনা—এর সবকিছু জানলেই কেবল মতামত দেয়া সম্ভব রাস্তাটির জন্য বরাদ্দটি পর্যাপ্ত কি না।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, নাগরিক হিসেবে কী তথ্য জানা প্রয়োজন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন প্রথমেই। কারণ, অনেক সময় আমরা জানি না, ঠিক কোন তথ্যটি চাইলে আমি আমার উত্তরটি পাব। নাগরিক কেন তথ্যটি চাইছেন, এটি জানাতেও তিনি বাধ্য নন।

নাগরিকের চাহিদাকৃত কিছু তথ্যের উদাহরণ দেয়া যাক—

১. বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্তি এবং গ্রেডেশনের নীতিমালার কপি। অনুমোদন কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনের কপি।

২. মহামান্য হাইকোর্টের ৪ মে ২০০৯ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে অনুযায়ী বরিশাল জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

৩. সরকারের ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচিতে শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কতজন নারী ও পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রয়েছে।

৪. সরকারের বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা পাওয়ার জন্য কোথায় কীভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তার প্রক্রিয়া।

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রক্রিয়া

- লিখিত আবেদন।[২১]
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম (ফ্যাক্স) বা ই-মেইলে তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে হবে।
- নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে (ফরম 'ক')। কিছুদিন আগেও আমরা যারা তথ্য অধিকার আইনের চর্চার ক্ষেত্রে বলতাম, সাদা কাগজেও আবেদন করা যাবে, তবে এখন

[২১] কোনো মৌখিক আবেদন বা মৌখিক উত্তর তথ্য অধিকার আইনের চর্চা নয়

আমরা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি ফরমটি ব্যবহারের ওপরই। প্রথমত, পরবর্তী সময়ে আপিল ও অভিযোগের জন্য আপনাকে অবশ্যই নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করতে হবে। তাই চর্চাটি আবেদন থেকে শুরু করাই ভালো; আর দ্বিতীয়ত, তথ্য চাওয়ার মাধ্যমে আমরা কর্তৃপক্ষকেও আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন করতে পারব।

- ফরমের ১ নম্বর অংশটি পরিচিতিমূলক (নাম, ঠিকানা, ফোন, ই-মেইল);
- ২ নম্বর পয়েন্টটিতে তথ্যচাহিদা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এখানে প্রশ্নটি ঠিকভাবে করা না হলে উত্তর ভাসা ভাসা এবং এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তথ্যের চাহিদা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উত্তর	কী চাইলে প্রত্যাশিত উত্তর পাওয়া যেত
'কাটাখালী নদীর ভাঙন থেকে গাইবান্ধা জেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প'-এর আওতায় কী ধরনের কাজ করা হবে?	নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ করা হবে।	'কাটাখালী নদীর ভাঙন থেকে গাইবান্ধা জেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প'-এর প্রকল্প-প্রস্তাব ও কার্যাদেশের কপি
প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান, দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান কী কী নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে?	পিপিআর ২০০৮-এর নীতিমালার ভিত্তিতে করা হয়েছে।	প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান, দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদানের নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের কপি

- ৩ নম্বর পয়েন্টে কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী, লিখতে হবে। ছাপানো, লিখিত, ফটোকপি উল্লেখ করে দিতে হবে। পরিদর্শনের বিষয়টিতেও বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

  উদাহরণ :
  একজন নাগরিক বেশ কিছু তথ্য জানতে চান। তার মধ্যে একটি ছিল—যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ অংশে যে পাইলট ড্রেজিং করা হয়েছে, ড্রেজিং বাবদ ব্যয় ও উত্তোলনকৃত বিল, বকেয়া বিল সম্পর্কে ফাইল দেখতে ও ফটোকপি পেতে চাই।

  পরবর্তী সময়ে আপিলের পর, আপিল কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয় সব ফাইল দেখতে দেওয়ার জন্য। পরবর্তী সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসে এসে ফাইল দেখতে বলেন ঠিকই, কিন্তু সে অনুযায়ী কোনো ফাইল সেভাবে ছিল না। ফলে তার পুরো তথ্য আবেদনটিরই কোনো উত্তর তিনি পাননি।

- ৪ নম্বর পয়েন্টে তথ্য যিনি গ্রহণ করবেন, তার নাম ও বিবরণ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যিনি আবেদন করছেন, তিনি নিজেই হতে পারেন বা অন্য কারও নাম, যিনি আবেদনকারীর পক্ষে তথ্য নেবেন, তার নাম এখানে দিতে পারেন।

- ৫ নম্বর পয়েন্টে সহায়তাকারীর নাম লিখতে হবে, এখানে প্রান্তিক মানুষকে তথ্য আবেদনে সহযোগিতা করার একটি সুযোগ দেয়া হয়েছে। নাগরিক নিজে আবেদন করতে পারবেন এবং অন্যকেও সহযোগিতা করতে পারবেন।

- ৬ নম্বর পয়েন্টে তথ্য প্রদানকারীর নাম ও বিবরণ দিতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেই চাওয়া হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে প্রথমেই। এ ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম জানা থাকে, তাহলে উল্লেখ করে দেয়া যায়, অথবা তথ্য কমিশনের ওয়েব ঠিকানায়[২২] দেখে নেয়া যায়। তবে অনেক অফিসে এখনো পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এমন অফিসের ক্ষেত্রে জেনে নিতে হবে, কার কাছে আবেদন করবেন। এখানে সচেতন নাগরিক হিসেবে আইনের বিধানের কথা ওই অফিসকে জানিয়ে আসাও কর্তব্য।

২০১১ সালের তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বেশ কটি অভিযোগ আমলে নিতে পারেনি শুধু যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন না করায়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

বিষয়	আবেদন করেছেন	আবেদন করতে হবে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ই-ভোটিং	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে	নির্বাচন কমিশনে
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মালামাল ক্রয়	ঢাকা সিটি করপোরেশনে	কিশোরগঞ্জ পৌরসভায়

- আবেদনের তারিখ অবশ্যই দিতে হবে এবং তথ্য আবেদনটি অবশ্যই স্বাক্ষর করে জমা দিয়ে প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র নিতে হবে।

- **অন্যান্য :** তথ্য মূল্য প্রদানের বিষয়টি প্রস্তুতিতে রাখতে হবে। তবে অযৌক্তিক মূল্য দিতে বাধ্য করা হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালায় তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত ফি কোড রেঞ্জ ১৮০০ এর লেভেল-৪ কোড (অর্থনৈতিক কোড) ১৮০৭ এ জমা দিতে হবে।

কুইজ

একজন নাগরিক পাঁচ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র কিনেছেন। মেয়াদ উত্তীর্ণের ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি নির্ধারিত লাভসহ টাকাটি পাচ্ছেন না। তিনি নাগরিক হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে কী তথ্য জানতে চাইবেন?

[২২] তথ্য কমিশনের ওয়েব ঠিকানা: www.infocom.gov.bd

আবেদনপত্রের নমুনা

তফসিল

ফরম 'ক'

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম	:	শাহানা বেগম
পিতার নাম	:	আব্দুর রহমান
মাতার নাম	:	আম্বিয়া বেগম
বর্তমান ঠিকানা	:	শেখ রাসেল সড়ক, লক্ষ্মীপুর
স্থায়ী ঠিকানা	:	শেখ রাসেল সড়ক, লক্ষ্মীপুর
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	:	ই-মেইল : aaa@yahoo.com মোবাইল :
পেশা	:	শিক্ষকতা
২। কী ধরনের তথ্য	:	আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৮(১) অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পেতে চাই : ক) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় মোট খাসজমির পরিমাণ। খ) খাসজমি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবার বাছাই করার প্রক্রিয়া কী। গ) ২০১০-২০১১ অর্থবছরে লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার খাসজমি থেকে যাদের খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তাদের নাম, বিবরণসহ তালিকা।
৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী	:	ফটোকপি
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	:	শাহানা বেগম, সহকারী শিক্ষক, "ক" প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	:	প্রযোজ্য নয়
৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	:	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়, সদর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর
৭। আবেদনের তারিখ	:	২৯/০১/২০১২

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(খ) আপিল প্রক্রিয়া

আপিলের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে–

- তথ্য আবেদন করে তথ্য না পেলে আপিলের ধাপ অতিক্রম না করে অভিযোগ করাটা তথ্য অধিকার আইনের বিধানকে সমর্থন করে না।
- আপিল অবশ্যই নির্ধারিত ফরমে অর্থাৎ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর ফরম 'গ' অনুযায়ী করতে হবে।
- আপনি যে দপ্তরে তথ্য আবেদন করেছেন, তার অব্যবহিত উর্ধ্বতন অফিসের প্রশাসনিক প্রধান বরাবর আপিল করতে হবে, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি জেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়ে তথ্য আবেদন করেন, সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান বরাবর আপিল করতে হবে।
- আপিল ফরমে কোথাও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম লেখার জন্য কোনো পয়েন্ট নেই। সে ক্ষেত্রে একটি ফরোয়ার্ডিং লেটার দিয়ে আপিল আবেদন ফরমটি সংযুক্ত করা যেতে পারে অথবা ফরমের ওপরের অংশে আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা লেখা যেতে পারে।

আপিল আবেদন ফরোয়ার্ডিং লেটারের নমুনা

বিভাগীয় পরিচালক– স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খুলনা
ও
আপিল কর্তৃপক্ষ

বিষয় : 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ভিত্তিতে আপিল আবেদন প্রসঙ্গে

মহোদয়,
আমি বাংলাদেশের 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে **২৫০** শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে সংযুক্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি। তিনি 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী কোনোরূপ তথ্য প্রদান না করায় আপনার নিকট আপিল করছি। আপিল আবেদন ফরমটি সংযুক্ত করছি।

অতএব আমার আপিল আবেদন গ্রহণপূর্বক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্বাক্ষর

- ১ ও ২ নম্বর পয়েন্ট পরিচিতিমূলক ও তারিখসংক্রান্ত
- ৩ নম্বর পয়েন্টে যদি কোনো উত্তর আদেশ পেয়ে থাকেন, যুক্ত করা হয়েছে বলতে হবে; উত্তর বা আদেশ না পেলে সেটাও লিখতে হবে।
- ৪ নম্বর পয়েন্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম লিখতে হবে, ইতিমধ্যে আপনি জেনে গেছেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে।
- ৫ নম্বর পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত বিবরণে আবেদনের বিষয় কী ছিল উল্লেখ করে প্রতিকার চাইছেন, এ বিষয়ে লিখতে হবে।
- ৬ নম্বর পয়েন্টে সংক্ষুব্ধতার কারণ হিসেবে তথ্য না পাওয়া, আবেদন না নেয়া, অসম্পূর্ণ, ভুল আংশিক তথ্য দেয়া—এসব বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
- ৭ নম্বর পয়েন্টে তথ্য অধিকার আইনের ২৪(১), (২), (৩) ও (৪) ধারা এবং উপধারা উল্লেখ করে দিতে পারেন।
- ৮ নম্বর পয়েন্টে প্রত্যয়ন হিসেবে বলতে পারেন, 'উপরে বর্ণিত আমার সকল তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক'।
- ৯ নম্বর পয়েন্টে আবেদনপত্রের কপি, আদেশ থাকলে, অসম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার কিছু থাকলে যুক্ত করতে পারেন।

ফরম 'গ'
(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

আপিল আবেদন

১.	আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা	:	জহিরুল ইসলাম এম এম আলী রোড সমবায় ইউনিয়ন ভবন, যশোর
২.	আপিলের তারিখ	:	(আপিল আবেদনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে)
৩.	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	:	কোনো আদেশ পাওয়া যায় নাই।
৪.	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ	:	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর।

৫. আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আমি জহিরুল ইসলাম, গত ১২/০২/২০১২ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ (আবেদনপত্রের কপি সংযুক্ত) করেছিলাম। ক. তিন মাসের বেশি সময় ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত চিকিৎসকদের নামের তালিকা ও অনুপস্থিতির কারণ; খ. হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, শিশু ওয়ার্ড ও এক্স-রে বিভাগে পড়ে থাকা অকেজো যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানের নামের তালিকা; গ. এসব যন্ত্রপাতি মেরামত-সংক্রান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সর্বশেষ প্রতিবেদনের ফটোকপি; ঘ. হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত কর্মচারী ও সরকারি অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অতিরিক্ত কর্মচারীর তালিকা; ঙ. করোনারি কেয়ার ইউনিট খোলা-সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য। উল্লিখিত বিষয়ে কোনো ধরনের তথ্য না পাওয়ায় আইনের ২৪(১), (২), (৩) ও (৪) ধারার ভিত্তিতে আমি আপিল করতে বাধ্য হচ্ছি।
৬. আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	:	২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লিখিত তথ্য প্রদান না করায় এবং অপারগতার কারণ না জানানোর জন্য আপিল করছি এবং এর প্রতিকার চাইছি।
৭. প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	:	'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১), ৯(১) এবং ২৪(১), (২), (৩) ও (৪) ধারা এবং উপধারা হচ্ছে আমার এই আপিল আবেদনের প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি।
৮. আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	:	আমি জহিরুল ইসলাম, পিতা-মো. হেদায়েতুল ইসলাম, মাতা-রোকেয়া বেগম, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, উপরে বর্ণিত আমার সব তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক।
৯. অন্য কোন তথ্য যাহা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	:	আবেদনপত্রের কপি

আপিলকারীর স্বাক্ষর

(গ) অভিযোগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারবে। পূর্ববর্তী অংশে কী কী কারণে অভিযোগ করা যাবে, তা আলোচনা করা হয়েছে। ২০০১ সালের তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি-সংক্রান্ত) বিধিমালায় উল্লিখিত ফরম[২৩] অনুযায়ী অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ ফরমটির অনেকাংশে আপিল ফরমের অনুরূপ।

- বাংলাদেশে তথ্য কমিশন ঢাকায় অবস্থিত। উল্লেখ্য অভিযোগ ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব।
- প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর একটি ফরোয়ার্ডিং দিয়ে নির্ধারিত ফরমে অভিযোগ করতে হবে

তারিখ :

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বিষয় : 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' ভিত্তিতে অভিযোগ প্রসঙ্গে

মহোদয়,

আমি বাংলাদেশের 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে গত ০৭/০২/২০১২ ইং তারিখে সংযুক্ত ফরমে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি। তিনি 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদান না করে উল্লিখিত বিষয়ের অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেন এবং আবেদনের ৩ নম্বর বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২৭/০৩/২০১২ ইং তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ বরাবর আপিল আবেদন করি, কিন্তু এযাবৎ কোনো উত্তর পাইনি।

অতএব, আমার অভিযোগ গ্রহণপূর্বক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী আমাকে তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন বলে আশা করছি। অভিযোগ ফরমটি সংযুক্ত করা হলো।

বিনীত

স্বাক্ষর

[২৩] ফরম ক [প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য] অভিযোগ দায়েরের ফরম

- 'অভিযোগ নং' এটি তথ্য কমিশন পূরণ করবে।
- আপিল ফরমের অনুরূপ বিবরণ লিখতে হবে। উল্লেখ্য, আপিলে যদি কোনো নির্দেশ পেয়ে থাকেন তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।
- সবশেষে সব কাগজপত্রের কপি (আবেদন ও আপিল ফটোকপি, কোনো আদেশ থাকলে তার কপি)
- নিচে সত্যপাঠ ও তারিখ দিতে হবে।

অভিযোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় না মেনে অভিযোগ দায়ের করলে অভিযোগ আমলে নাও আনতে পারে তথ্য কমিশন–

- ✓ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ না করলে।
- ✓ আবেদনের পর আপিল না করে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করলে।
- ✓ আবেদন ও আপিল আবেদনের কপি সংযুক্ত না করলে।
- ✓ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন না করলে।
- ✓ আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকলে।

২০১১ সালের তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী তথ্য কমিশন বেশ কটি অভিযোগ আমলে নিতে পারেননি শুধু যথাযথ আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল আবেদন জমা না দেয়ার কারণে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

আবেদন করেছেন	আপিল করেছেন	আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন/মন্তব্য
কুষ্টিয়া জেলা স্কুল	জেলা প্রশাসকের কাছে	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়
কুষ্টিয়া চিনিকল	শিল্প মন্ত্রণালয়ে	চেয়ারম্যান, সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন
সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	এ ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ ঠিক থাকলেও আবেদনটি করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	যুগ্ম সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	এ ক্ষেত্রে উক্ত কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন এবং অধ্যক্ষ বরাবর আপিল করতে হবে।

কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য আবেদন গ্রহণ করতে না চাইলে—

- রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা যাবে।
- আপিল করা যাবে।
- আইনের ১৩(১) (ক) অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

অভিযোগ দায়েরের ফরমের নমুনা

ফরম 'ক'
[প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ দায়েরের ফরম

অভিযোগ নং :

১. অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	:	সারোয়ার হোসেন ঠিকানা :
২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ	:	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৩. যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা	:	< নাম >, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকৌশলী নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, "ক" জেলা। স্মারক নং-আই-ক/১২, তারিখ : ২৬/০২/২০১২ ইং তারিখে সরবরাহকৃত তথ্যের কপি সংযুক্ত
৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আমি সারোয়ার হোসেন, গত ৭ ফেব্রুয়ারি'১২ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, "ক" জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিম্নলিখিত তথ্যসংক্রান্ত কাগজের ফটোকপি পাওয়ার জন্য অনুরোধ (আবেদনপত্রের কপি সংযুক্ত) করেছিলাম— ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, "ক" জেলার দরপত্র নম্বর-১৩/গ ২০১১-২০১২-এ "গ" নদীর ভাঙন থেকে "ক" জেলার "ক" ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প-এর আওতায় কী ধরনের কাজ করা হবে? *অর্থাৎ Estimate বা প্রাক্কলন*-এর অনুলিপি। খ) প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান, দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান কী কী নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে? উক্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি। গ) দরপত্র খোলার পর প্রতিটি গ্রুপে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করা ঠিকাদারদের *দরের তুলনামূলক বিবৃতি বা সিএস রেকর্ড (Comparative statement)* বা এর ফটোকপি (যা ঠিকাদার বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এবং তাদের স্বাক্ষর করা)। প্রতিটি গ্রুপের কার্যাদেশ মূল্য কত? কার্যাদেশের অনুলিপি। উল্লিখিত বিষয়ের অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান এবং আবেদনের ৩ নম্বর চাহিদাটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ---------- তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, "ক" জেলা বরাবর আপিল করি, কিন্তু এযাবৎ কোনো উত্তর পাইনি।

৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ	:	অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান এবং আবেদনের ৩ নম্বর বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হওয়ায় প্রতিকার চেয়ে এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইনের ২৫ ধারা (১) ও (২) উপধারার ভিত্তিতে আমি অভিযোগ করছি।
৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা	:	'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১), ৯(১) এবং ২৪ ও ২৫ ধারা হচ্ছে আমার প্রার্থিত প্রতিকারের যৌক্তিকতা।
৭. অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	:	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের কপি আপিল আবেদনের কপি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত তথ্যের কপি

সত্যপাঠ

আমি সারোয়ার হোসেন, পিতা-মো. আজমত আলী, এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগিক দিক

সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন

সারা বিশ্বে যেসব দেশে তথ্য অধিকার আইন আছে, সেসব দেশে আইনটি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জনগণের তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের বড় দাবিদার সাংবাদিকেরা, যার ইতিহাস পূর্ববর্তী অনেক প্রকাশনাতেই আলোচনা করা হয়েছে; তাই আর পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

আমাদের দেশে সাংবাদিকেরা মূলত সূত্রের ওপর নির্ভরশীল, তারাই খবর তৈরি করে। আমলা ও রাজনীতিবিদেরাও সাংবাদিকের এ কৌশলের সঙ্গে পরিচিত এবং সে অনুযায়ী তাদের নিজেদেরও সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অভ্যন্তরীণ কৌশল রয়েছে। সূত্রের প্রতি অতি নির্ভরশীলতা অনেক সময় খবরের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করে ও বিভ্রান্তিকর হয়। পাঠকের আগ্রহ থাকে অনেক সময় খবরের অনেক গভীরে।

আবার হাতে পর্যাপ্ত কাগজপত্র থাকলেও অনেক সময় দ্বিধা থাকে, শেষ পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে এসব কাগজপত্র জোগাড় হয়েছে তারা তা স্বীকার করেন কি না।

বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক গণমাধ্যম বাণিজ্যে প্রতিটি গণমাধ্যম-মালিক সাংবাদিকদের কাছে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে। এখন 'ব্রেকিং নিউজের' যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে সাংবাদিকেরাও বিভিন্ন কৌশলের খোঁজে রয়েছেন। টেলিভিশন সাংবাদিকতা যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে সেখানে ছাপা মাধ্যমের চ্যালেঞ্জ আরও একটু বেশি। তথ্য অধিকার সারা বিশ্বে সাংবাদিকদের যোগ্যতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং তাদের অনুসন্ধানের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণ রেখেছে। আমাদের দেশেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সুচনা হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি, তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিককে নতুন কী দেবে?

- **প্রামাণ্য দলিল**—কারণ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সংগৃহীত তথ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিল দেয়া থাকে। উদাহরণ—রাঙামাটির একজন সাংবাদিক হিমেল চাকমা এলাকার ইটভাটা স্থাপনে কোনো নীতিমালার ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে জানতে চেয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে। এর লিখিত উত্তর হলো রাঙামাটিতে কোনো ইটভাটা নেই, যদি থাকে তা অবৈধ। এ রকম লিখিত উত্তর তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারেই পাওয়া সম্ভব। অন্যথায় 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' বলে হয়তো লিখতে হতো।

- **তথ্যে পরিদর্শনের সুযোগ**—যা থেকে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে' আসতে পারে। ভারতের *আউটলুক* ম্যাগাজিনের সৈকত দত্ত (সেরা তথ্য অধিকার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক) চাল রপ্তানিতে ২৫০০ কোটি রুপির দুর্নীতিবিষয়ক একটি তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। তার অনুসন্ধানে তিনি বিভিন্ন দপ্তরের ফাইল পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি মন্ত্রণালয়ের ফাইলে দেখতে পান, চাল রপ্তানিতে দুর্নীতি ধরা পড়ার কারণে অন্য একটি দেশে আরেকটি বড় ধরনের চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ পেলে মন্ত্রী পর্যন্ত বিব্রত হন এবং পদত্যাগে বাধ্য হন।

- **তথ্য না পেলেও বড় খবর**—ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সাংবাদিক ইমরান হোসেন সাতটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য চেয়েছিলেন—১৯৯২ সালে বিষাক্ত প্যারাসিটামল খেয়ে শিশু মারা গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে কী তথ্য আছে জানতে চেয়ে। তিনি কোনো তথ্য পাননি। আর এখানে লুকিয়ে ছিল আসল তথ্য। সেটা হলো এত বড় ঘটনার কোনো রেকর্ড ঔষধ প্রশাসন রাখেনি। তার সংবাদের শিরোনাম ছিল—All records 'lost' from drug office.

তথ্য অধিকার আইন অনুশীলন করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিকই নিজেদের সূত্রের কাছে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন—এত দিন যেভাবে নিচ্ছিলেন সেভাবেই কেন নিচ্ছেন না, কেন আবেদন করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্টের (FOIA) আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়াও অন্য দেশের নাগরিকও আমেরিকার ফেডারেল সরকারের কাছে তথ্য আবেদন করতে পারেন।

তথ্য আবেদন করার আগে একজন সাংবাদিককে যা অবশ্যই জানতে হবে—

১। তথ্য আবেদনের নির্দিষ্ট ফরম রয়েছে (ফরম 'ক')। আপনার আবেদনটি ফরমে করুন।

২। আবেদনের ২ নম্বর পয়েন্টে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে' আবেদন করছেন—এই লাইনটি উল্লেখ করুন।

৩। নির্দিষ্ট কোনো রেকর্ড, ডকুমেন্ট দেখতে চান। কোনো মতামত, উপদেশ, পরামর্শ নয়।

৪। যদি আপনি কোনো ফাইল পরিদর্শন করতে চান, সে ক্ষেত্রে আপনার আবেদনের কোন প্রশ্নটির উত্তরে তা দেখতে চান, একই সঙ্গে উল্লেখ করুন।

৫। আমাদের দেশের তথ্য অধিকার আইনে আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো শব্দসীমা (লিমিট) দেয়া হয় নাই[২৪], তবে আপনার দরখাস্তটি অযথা লম্বা করবেন না।

৬। তথ্যের সময়কাল উল্লেখ করুন। যেমন, ২০১০-২০১১ অর্থবছর বা ২০১০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৭। যদি আপনি কোনো জীবন, মৃত্যু ও কারাগার থেকে মুক্তির বিষয়ে তথ্য চান, তাহলে আপনার আবেদনপত্রে ধারা উল্লেখ করে বলুন, আপনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য চাইছেন।

৮। লিখিত আবেদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাপ্তি-স্বীকারের কপি বুঝে নিতে হবে।

১০। তথ্যমূল্য পরিশোধ করতে হবে এ ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

---

[২৪] ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে তথ্য আবেদনে একটিমাত্র বিষয়ে সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দের মধ্যে আবেদন করতে হয়, এবং এটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ লিমিট দেয়া আছে।

টিপস

- ✓ তথ্য অধিকার আইনের সব বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখুন। বিশেষ করে, তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এরূপ তথ্যের আওতা সম্পর্কে।
- ✓ তথ্যটি কোন বিভাগ, দপ্তর বা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত, সে সম্পর্কে আগেই পরিষ্কার হোন। এর ফলে হয়তো আপনি ২০ দিন পিছিয়ে যাবেন।
- ✓ আপনি অনেক সময় ভেঙে ভেঙে তথ্য পাবেন, তখন ছোট ছোট স্টোরি করার লোভ সংবরণ করতে হবে, কারণ আপনি বড় গল্পের জন্য সময় ব্যয় করছেন।
- ✓ আপনার গল্পটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখুন, অধিকাংশ আবেদনের তথ্য থাকে অসমাপ্ত ও বিভ্রান্তিকর, এ ক্ষেত্রে আপনার দূরদর্শিতা থাকতে হবে সত্যি গল্পটা লেখার।
- ✓ আপনার আবেদনটি ছোট ও সহজ রাখুন; অন্যথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য আসলে তা বোঝা হবে, আপনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।
- ✓ তথ্যের সীমারেখা আওতার মধ্যে রাখুন, অনেক বেশি পুরোনো তথ্য হয়তো আপনি সহজে পাবেন না।
- ✓ আপনার প্রশ্নটি এমনভাবে করুন, যাতে যার কাছে তথ্য চেয়েছেন তিনি যেন বুঝতে না পারেন, আপনার পরিকল্পনা কী।
- ✓ যখন আপনি নিশ্চিত নন যে কোনো একটি বিশেষ ফাইলের কী দেখতে চাইবেন, সে ক্ষেত্রে আপনি পরিদর্শনের সুযোগটি ব্যবহার করুন।
- ✓ স্পর্শকাতর তথ্যের আবেদনের ক্ষেত্রে কৌশলী হওয়া উচিত। আপনি যখন একটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, তখন একই সঙ্গে দুই নামে তথ্যগুলো একটু এদিক-সেদিক করে দুটি আবেদন করুন। আমলাতন্ত্রের চাপে আপনাকে অনেক সময় ফ্যাব্রিকেটেড তথ্য দেয়া হবে, সেজন্য এ বাড়তি সতর্কতা।
- ✓ স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করা আছে, এমন তথ্য আইনের আওতায় না চাওয়া।
- ✓ বায়বীয় অনুরোধ না করা—যেমন, প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চাই।
- ✓ সাধারণ দৃষ্টিতে প্রদান করা সম্ভব নয়, এমন তথ্য না চাওয়া।
- ✓ একসঙ্গে একই আবেদনে অসংখ্য তথ্য প্রদানের অনুরোধ না করা।
- ✓ একই তথ্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারে থাকলে বিকল্প স্থানেও আবেদন প্রেরণ।
- ✓ আবেদনের পর তথ্য প্রদানকারী তথ্য গ্রহণের আহ্বান জানালে তত দিনে প্রয়োজন শেষ হলেও তথ্য সংগ্রহ করা, তা না হলে তথ্য প্রদানকারীর মধ্যে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে।
- ✓ তথ্য প্রদানকারীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকা, যেমনভাবে আপনি বিভিন্ন অফিসে সূত্র তৈরি করেন, সেভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া তৈরি করে নিতে পারেন (যদিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘন ঘন পরিবর্তন হয়, সে ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার-সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র তৈরি করা)।
- ✓ তথ্য কমিশনে নিজের সূত্র তৈরি করা।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে সাংবাদিকের বাধা—

- নিজস্ব নৈতিকতা, মূল্যবোধ;
- সংবাদমাধ্যমের পলিসি;
- তত্ত্বাবধায়ক/নিউজরুমের অসহযোগিতা;
- সামাজিক প্রভাব;
- সূত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, সূত্র হারাতে হতে পারে;
- সময়, অর্থ, ধৈর্য।

সাংবাদিকের ক্ষেত্রে তার সংবাদমাধ্যমের নীতিগত অবস্থান একটি বড় বিষয়

একটি সিটি করপোরেশনের নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য (বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজস্ব খাতে যাদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের নাম-ঠিকানা এবং কোন বিভাগে কর্মরত তার তালিকা, বিজ্ঞাপনের কপি) জানতে আবেদন করেন এবং সংবাদ তৈরির জন্য ইস্যু নির্বাচন করেন জেলা পর্যায়ের একজন সাংবাদিক। পরিকল্পনাটি তিনি তার ঢাকা অফিসে জানান, ঢাকা অফিস থেকে এ প্রতিবেদন করার অনুমতিও পান। সে অনুযায়ী সিটি করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি লিখিতভাবে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে তাকে তথ্য অধিকার আইনের গেজেট দেখালে তিনি তথ্য দিতে সম্মত হন। এ ঘটনার পরের দিনই সকালে ওই সাংবাদিকের পত্রিকা অফিস থেকে তিনি নির্দেশ পান, 'পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এ মুহূর্তে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাচ্ছেন না। সুতরাং যে পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ওই পর্যন্তই থাক, পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে।' তথ্য অধিকার নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে সাংবাদিকের উপলব্ধি হলো, সাংবাদিকের যে পেশাগত বাধা রয়েছে জনগণের তা নেই। তাই তথ্য অধিকার আইন অনেক বেশি জনগণের আইন, জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে অসংলগ্নতাকে বের করে আনতে।

সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে যা করতে পারেন তার কিছু উদাহরণ নীচে দেয়া হলো। তবে সাংবাদিকের কর্মক্ষেত্র আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে পারে—

আইন বাস্তবায়ন অবস্থা মনিটরিং

সরকারের করণীয় দিকগুলো

- আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে কেন্দ্রীয়ভাবে (মন্ত্রণালয়) কী ধরনের পদ্ধতি (মেকানিজম) নেয়া হয়েছে।
- সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারকে প্রশিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধকরণে কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
- জনগণকে সচেতন করার জন্য উদ্যোগ
- আইনের বিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সরকারি কার্যালয়গুলোতে।

কর্তৃপক্ষের করণীয়

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দৃশ্যমান করা হয়েছে কি না।
- স্বপ্রণোদিতভাবে যেসব তথ্য প্রকাশের কথা, তা যথাযথভাবে হচ্ছে কি না।
- বার্ষিক প্রতিবেদন সহজলভ্য করা হয়েছে কি না।
- তথ্য সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপনায় যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না।
- তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।
- জনগণকে সচেতনতার কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
- তথ্য আবেদন গ্রহণ করছে কি না এবং সময়মতো তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কি না।
- তথ্য আবেদন বাতিল করার কারণ যৌক্তিক কি না ইত্যাদি।

তথ্য কমিশনকে পর্যবেক্ষণ

- সময়মতো ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তি।
- কেস স্টাডি করতে পারেন আপিল ও অভিযোগের বিষয়ে।
- প্রবিধানমালা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন অবস্থা।
- জরিমানা ও বিভাগীয় শাস্তির ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ।
- সরকারের কাছে কমিশন কী ধরনের সুপারিশ করছে।
- কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনকে বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট।

সরকারি সেবা খাতের কার্যকারিতার অনুসন্ধান

সরকারি তহবিল ব্যবহার-সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান

- মধ্যমেয়াদি বাজেট-কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বার্ষিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কি না।
- সরকারের ঘোষিত কোনো নীতিমালার সঙ্গে বাজেটের বরাদ্দ কিংবা বাজেট-বক্তৃতার কোনো অংশ সাংঘর্ষিক/অস্বচ্ছ কি না।
- উন্নয়ন বাজেটে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কিনা।
- উন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প গ্রহণের কোনো নীতিমালা।
- অনুমোদিত প্রকল্পে অর্থ ছাড়করণ।
- সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ করা হচ্ছে কি না।
- বাজেটের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য আছে কি না।
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের গতিপ্রকৃতি।
- 'জুন সমাপ্তি' উপলক্ষে অনিয়মিত কোনো ব্যয় আছে কি না।
- বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের পর্যবেক্ষণ (আইএমইডি, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা)।

- জনগণের অর্থ ব্যয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদন কী বলে?
- নীতিমালা মূল্যায়নে কোনো বিশেষ পরিবর্তন আছে কি না ইত্যাদি।

তা ছাড়া সঠিক তথ্যটি আপনাকে চাইতে হবে।
যেমন, যদি আপনি কোনো গণপূর্ত বিভাগের কাজ দেখেন, সে ক্ষেত্রে আপনি চাইবেন–

- দরপত্র আহ্বান, তুলনামূলক বিবরণী;
- কার্যাদেশের কপি;
- কার্যাদেশে মনিটরিংয়ের সুযোগ কী কী দেয়া হয়েছে;
- এ কাজটি কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে, তার কপি;
- কাজ তদারকি/কাজ সম্পাদনের রিপোর্ট;
- কাজের নকশা, মানচিত্র।
- কাজের উপকরণ

ভূমি ব্যবস্থাপনা

- সব খাসজমির রেকর্ড, নকশা, মানচিত্র;
- সব সরকারি, কৃষি, বনভূমির জমির নকশা ও মানচিত্র;
- ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ।

নাগরিকের অভিযোগগুলোকে তুলে ধরা

- নাগরিকের তথ্য আবেদন অবস্থা সম্পর্কে সময়ে সময়ে নিজেকে হালনাগাদ রাখা;
- নাগরিকের সব অভিযোগ জড়ো করা এবং কপি সংগ্রহ;
- প্রতিটি অভিযোগের বিপরীতে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, তথ্য কমিশন সূত্রের প্রতি নজর রাখা।

ভালো কাজের উদাহরণ/জনসচেতনতা সৃষ্টি

- জনগণের তথ্য প্রাপ্তির গল্পগুলো তুলে ধরা;
- তথ্য কমিশনে সফলভাবে নিষ্পত্তির গল্প তুলে ধরা
- সম্পাদকীয়;
- সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিয়মিত লেখা।

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে সতর্ক চোখ রাখতে হবে। সারা দেশের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের এক বছরের অগ্রগতির যে চিত্র এখানে পাবেন, তা আপনার গভীরতাধর্মী প্রতিবেদনের অনেক বিষয় জোগাবে।

বেসরকারি সংস্থার সামাজিক নিরীক্ষায় তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল থেকে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, সে অর্থে তথ্যের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নাগরিকের প্রবেশাধিকার রয়েছে।

সাংবাদিকদের মধ্য থেকে দাবি ওঠার পর আইনটি বাস্তব রূপ দান করার যে দীর্ঘ দাবি আদায়ের পথচলা, তার প্রধান অংশীদার হলো বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা এনজিও প্রতিনিধি।

আমাদের দেশে তথ্য অধিকারের দাবি জনসাধারণের মধ্য থেকে আসেনি। শুধু ভোটে অংশগ্রহণ করা ছাড়া এ দেশে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়ায় খুব কম। ভারতে সত্যিকারের তথ্য অধিকার আন্দোলনের দাবি ওঠে কিন্তু রাজস্থানের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। রাজস্থানের সংগঠন মজদুর-কিষান শক্তি সংগঠন (এমকেএসএস) সর্বপ্রথম তথ্য অধিকার প্রয়োগ করে এলাকার সব উন্নয়নকাজের বিল-ভাউচার, মাস্টার রোলের কপি দেখতে চায়। এক বছর লেগে থেকে তারা তথ্য আদায় করে এবং গণশুনানিতে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের সামনে পেশ করে তাদের ফলাফল। দেখা যায়, মাস্টার রোলে এমন অনেক লোকের নাম আছে, যারা বেঁচে নেই; যাদের অস্তিত্বই নেই। রাজস্থানের এ জনশুনানি আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে তথ্য অধিকার আইনে রূপ পায়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারের পাশাপাশি সমানভাবে এনজিও কার্যক্রম, বিশেষ করে দারিদ্র্য হ্রাস, সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ মোকাবিলা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আশির দশক পর্যন্ত এসব সংস্থা মূলত সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত থাকলেও নব্বইয়ের দশকে অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচের জয়জয়কার দেখা যায়। অর্থাৎ এখন মাছ ধরার জন্য জাল দেয়া নয় বরং খাস জলাভূমিতে প্রবেশাধিকারের কথা জানতে দিচ্ছে ভূমিহীন মানুষকে।

এতকাল অবধি নাগরিককে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকারী এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন হলো তথ্য অধিকার আইন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের জন্য যে অর্থ আনছে, তার সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সে ব্যাপারে নাগরিকের তা জানার অধিকার রয়েছে। এটি হলো একটি প্রেক্ষিত।

আরেকটি প্রেক্ষিত হলো তথ্য অধিকার আইন এসব প্রতিষ্ঠানের হাতে একটি হাতিয়ারস্বরূপ কাজ করবে। অর্থাৎ তারা নিজেরাও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে (Social Accountability Tools) যেসব তথ্য সংগ্রহের কাজ করছে, সেখানে ব্যবহার করতে পারবে। ঠিক তেমনই নাগরিক যাদের পক্ষে কাজ করছে তাদের মাঝে তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের সহযোগিতা করতে পারবে। অর্থাৎ তথ্যচাহিদার দিকটি শক্তিশালীকরণে এনজিওদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষা, তৃতীয় পক্ষ দ্বারা মনিটরিং, নাগরিক স্কোর কার্ড জনগণের অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিমাপের ক্ষেত্রে বর্তমানে জনপ্রিয় টুলস। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে এনজিওগুলো স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার

আইন একটি শক্তিশালী দিক হতে পারে, যা স্থানীয় পর্যায়ে যেকোনো অসযোগিতামূলক আচরণ থেকে এই আইন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে।

কুইজ

আপনি টেলিফোনের লাইন পাচ্ছেন না; কারণ, আপনি ঘুষ দিতে চাননি, এক বছর পার হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আপনি কী জানতে চাইবেন, যাতে করে কর্তৃপক্ষ জবাবদিহিতায় আসবে?

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এনজিওর ভূমিকা :

- স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে এনজিওরা। তারাই পারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে নাগরিককে অধিক মাত্রায় তথ্য অধিকার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ এলাকাভিত্তিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছে তথ্য চাওয়ার জন্য; এবং বাংলাদেশে তথ্য কমিশনে ওই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রথম যে অভিযোগের শুনানি হয়েছিল তিনি একজন বেদেসর্দার—সউদ খান।
- নিজেরা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে স্থানীয় সেবা খাত, সরকারি অর্থের আয়-ব্যয়ের হিসাব, নীতিমালা বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে জনগণকে আলোকিত করতে পারে।
- স্থানীয় জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইনটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন, জনগণকে কী উত্তর দিচ্ছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
- তথ্য কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন।
- নিজেরা স্বপ্রণোদিত তথ্য উন্মুক্ত করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারেন।
- তথ্য অধিকার আইন নির্ধারিত ফরমগুলো পর্যাপ্ত রাখতে পারেন।
- তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিটি বছর অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তথ্য চাওয়া ও প্রদানের মধ্য দিয়ে কমিউনিটি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সংস্কৃতি ও অভ্যস্ততা চলে আসবে, এ বিষয়ে এনজিওর ভূমিকা রয়েছে।
- 'চ্যাম্পিয়ন'কে খুঁজে বের করতে হবে, যিনি ভালো তথ্যদাতা ও ভালো তথ্যগ্রহীতা, তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন নতুন কী দেবে

- যাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন তাদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাঝে আপনি উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারবেন।
- পেশাগত দক্ষতা বাড়বে।
- বৃহত্তর জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে আপনার সংস্থা বিশেষভাবে পরিচিতি ও জনসমর্থন পাবে।

সামাজিক নিরীক্ষায় তথ্য অধিকার আইন

যেকোনো সরকারি সেবা খাত, কার্যক্রম নীতিমালা অনুসন্ধানের একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো তথ্য অধিকার আইন। সামাজিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এমন বিশেষ ধরনের তথ্য প্রয়োজন পড়ে, যা একমাত্র তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করেই পাওয়া সম্ভব। কারণ এই আইন জনগণকে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ও জনগণের অর্থব্যয়-সংশ্লিষ্ট সব ধরনের দলিলপত্রে প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, যেমন—ভিজিডি, ভিজিএফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা—এসব কার্যক্রমের স্বচ্ছতা অনেক সময়েই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী আত্মীয়, খাদ্যশস্য (গম, চাল) পরিমাণে কম দেয়া, কমবয়সী মানুষকে বয়স্ক ভাতা প্রদান, চেয়ারম্যানের স্ত্রীর বিধবা ভাতা প্রাপ্তি—এসব অনেক ধরনের অভিযোগ আসে। সামাজিক নিরীক্ষা এসব অনুমান বা সন্দেহের অবসান ঘটাতে পারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহে তথ্য অধিকার আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

ভিজিডি-বিষয়ক একটি সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল—

✓ নির্বাচিত ভিজিডি কার্ডধারীদের ৯৭% তিন বেলা খেতে পায় (নিয়ম হলো—দুই বেলা কম খেতে পায়)।

✓ ৫০% বিবাহিত ও স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন (নিয়ম হলো—খানাপ্রধান হতে হবে নারী)।

✓ ভিজিডির অন্যতম শর্ত হলো গ্রুপটির উন্নয়ন—সেদিক থেকে এ গ্রুপটি কোনো সঞ্চয়ী হিসাব খোলেনি এবং কোনো আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পায়নি।

সূত্র : বিটা, চট্টগ্রাম

বিভিন্ন সেবা খাত নিরীক্ষণে কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো। এটি শুধু উদাহরণ, চর্চার ক্ষেত্রটি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা খাত

উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র নামে পরিচিত এ প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ জনগণ বিশেষভাবে এ প্রতিষ্ঠানটির ওপর নির্ভরশীল। এ সেবা খাতটি সম্পর্কে যেসব তথ্য রাখা প্রয়োজন তা হলো—

- ডাক্তার, নার্স, কর্মচারীর সংখ্যা কতজন থাকা উচিত ছিল, কতজন আছে;
- ওষুধের রেজিস্টার, বিতরণের রেজিস্টার;
- স্থানীয়ভাবে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়-প্রক্রিয়া;
- রোগীদের খাবার বরাদ্দ;
- সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার;
- সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবহার।

প্রাথমিক শিক্ষা

সরকার এখন সব খাতে ইন্ডিকেটর সূচক করেছে এবং সব বাজেটের একটি মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন হয়। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে বিশেষ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন, উপবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও একই শিক্ষকের সব বিষয় পড়ানো, স্কুল-ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বেচ্ছাচারিতা একটি সাধারণ অভিযোগ অভিভাবকদের। অন্যদিকে অভিভাবকের সভায় তাদের পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি, ইভ টিজিং প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশসহ বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, যা সামাজিক নিরীক্ষার বিষয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে যা দেখা যেতে পারে—

- শিক্ষকদের হাজিরা খাতা;
- ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা খাতা;
- ঝরে পড়ার হার (বিগত কয়েক বছর দেখা);
- উপবৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলি, বরাদ্দ, উপবৃত্তি প্রদানকারীদের তালিকা;
- শিক্ষকদের যোগ্যতা/নিয়োগ প্রক্রিয়া;
- ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার রেজুলেশন।

প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্য

এলাকার যেকোনো প্রকল্প ও স্কিম সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য রাখলে ওই প্রতিষ্ঠানটিও সজাগ হয়ে কাজ করবে। এখন অনেক দাতা সংস্থাও একটি তৃতীয় পাক্ষিক পরিবীক্ষণকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জনগণ যেকোনো সরকারি কাজের তদারকির জন্য যেকোনো দলিল দেখতে পাওয়ার অধিকার রাখে, সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো রাখা যেতে পারে :

- প্রকল্প প্রস্তাবনা;
- কার্যাদেশের কপি;
- ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া;
- নির্বাচিত ঠিকাদারের নাম-ঠিকানা;
- মোট বাজেট, খাতওয়ারি বাজেট;
- প্রকল্পের নকশা, মানচিত্র;
- স্পেসিফিকেশন;
- পরিমাপ বই (মেজারমেন্ট বুক—কাজের অগ্রগতির রেকর্ড বই ইঞ্জিনিয়ারের কাছে থাকে)।

সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

সাধারণত সড়ক ও জনপথ, সিটি করপোরেশন, প্রকৌশল বিভাগ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। তা ছাড়া ওয়াসার টেলিফোন লাইন স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সময়ে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের কাজের সমালোচনা সবচেয়ে বেশি। এ ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

ভিজিডি কর্মসূচিবিষয়ক তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ–

বাগেরহাটের স্থানীয় সংগঠন উদয়ন বাংলাদেশ জানতে পারে, ১০ জন গ্রাম পুলিশ ভিজিডি কার্ড পেয়েছেন। ভিজিডি নীতিমালা অনুযায়ী তাদের তা প্রাপ্য নয়। কিন্তু সংস্থাটির কাছে কোনো প্রামাণ্য দলিল ছিল না। তাই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে তারা আবেদন করে নিম্নলিখিত তথ্য চায় :

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন 'ক' ইউনিয়নে ২০১০-১১ অর্থবছরে—

ক) ভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচন ও বরাদ্দসংক্রান্ত নীতিমালার কপি;

খ) ভিজিডির কতজনের জন্য কী পরিমাণ বরাদ্দ ছিল;

গ) কার্ডপ্রাপ্তদের নাম ও বিবরণসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

পরামর্শ—

✓ দক্ষতা উন্নয়ন—নিজের ও যাদের স্বার্থে কাজ করছেন তাদের সবাইকে আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিন।

✓ যখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তথ্য অধিকার চর্চা করবেন তখন পুরো কমিউনিটিকে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দিন, অন্যথায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী কোণঠাসা হয়ে যেতে পারে।

✓ নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যেমন—ইউএসএআইডি প্রগতির সহযোগী সংগঠনগুলো স্থানীয় সেবা খাত পর্যবেক্ষণ করছে। তারা নাগরিক ফোরাম গঠন করেছে। এ ফোরাম সংঘবদ্ধভাবে কোনো অনুসন্ধান, পরিবীক্ষণের কাজ করতে পারে।

✓ অ্যাডভোকেসি করা—এমন একটি স্থানীয় ইস্যুকে নির্দিষ্ট করুন, যা নিয়ে বৃহত্তর জনস্বার্থে অ্যাডভোকেসি করা যাবে।

✓ গণমাধ্যমকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা—আপনার চিহ্নিত সমস্যাগুলো এবং আপনার তথ্য আবেদনের ভিত্তি সম্পর্কে স্থানীয় গণমাধ্যম প্রতিনিধি, যিনি ন্যায্য সাংবাদিকতা করেন, তাকে অবহিত করুন।

✓ সহযাত্রী তৈরি করুন। মনে রাখবেন, আপনি যে তথ্য জানতে চাইছেন, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এলাকার প্রভাববিস্তারকারীসহ অন্য শক্তিশালী জনেরা। তাই তথ্য অধিকারে আপনার পাশে থাকবে, এমন সহযাত্রী তৈরি করুন। স্থানীয় সমমনা অন্য সংস্থাকেও আপনার সঙ্গে যুক্ত করুন।

সর্বোপরি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এনজিওরা যদি সক্রিয় হয়, তাহলে তথ্য অধিকার আইন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং সেন্টার করতে যাচ্ছে, যাতে করে নাগরিক টেলিফোনে তথ্য আবেদন, আপিল অভিযোগ করতে পারে। এটি একটি কল সেন্টারের মতো কাজ করবে। উল্লেখ্য, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে বছরে ১ লাখের কাছাকাছি তথ্য আবেদন পড়ে, তথ্য কমিশন বছরে গড়ে ১১ হাজার অভিযোগ পায়।

তথ্য অধিকার আইন

প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা

তথ্য অধিকার আইনের তৃতীয় বছরে এর প্রায়োগিক কিছু সমস্যা নিয়ে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্যোগের অভাব, আইনটি চর্চার অভাব, আইন সম্পর্কে শিক্ষিত ও নিরক্ষর সব ধরনের জনগণের ধারণার অভাব, মিডিয়ার অনাগ্রহ—এসব সমস্যা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়ে আসছে, যা নিরসনের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়াস নিয়েছে তথ্য কমিশনসহ দেশের বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

আইনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি জোরদার করাসহ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগের পাশাপাশি এর চর্চার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন নাগরিক, তার কিছু নিচে আলোচনা করা হলো।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ : তথ্য অধিকার আইনের কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধারা ২(খ) (আ) ও (ই) মোতাবেক ইউনিয়নও কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের সংজ্ঞায় উপজেলাকে সর্বশেষ তথ্য প্রদান ইউনিট বলা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের একটি অভিযোগ থেকেও দেখা যায়, কমিশন এখন দ্বিধান্বিত এবং অভিযোগটি আমলে না নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে মতামত নেওয়ার জন্য জানতে চাওয়া হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদকে তথ্য প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হবে কি না। তথ্য কমিশন এখনো পর্যন্ত ইউনিয়নের তথ্য উপজেলা থেকে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করছে।[২৫]

(খ) আপিল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত প্রকাশ : এ উদ্যোগের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আপিল কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন। তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ অনুসারে গত দুই বছরে ১০৪টি অভিযোগে এটিই প্রতীয়মান হয় যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য না দেয়ার আদেশের সঙ্গে একমত।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়ন : কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, এ তথ্য তার তত্ত্বাবধায়ককে না জানিয়ে দিতে পারবেন না। অনেকে বলেছেন, আবেদন না করে গোপনে তথ্য নিয়ে যেতে।

(ঘ) তথ্য কেন চাওয়া হচ্ছে তা জানতে চাওয়া : সিদ্ধান্তের কপি, সভার রেজুলেশনের কপি, মাস্টাররোলের কপির ক্ষেত্রে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন এ তথ্য চাইছেন এবং কী করবেন এসব তথ্য দিয়ে।

---

[২৫] তথ্য কমিশন আইন মন্ত্রনালয়ে সুপারিশ করলে, আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ইতিবাচক মতামত দিয়েছে এবং তথ্য কমিশন আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র জারির অনুরোধ জানিয়েছে, যা বিবেচনাধীন।

(ঙ) তথ্য সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা : আপিল কর্তৃপক্ষ তথ্য পরিদর্শনের আদেশ দেওয়ার পর তথ্য নিতে গিয়ে দেখা গেছে, কোনো তথ্যই সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এমনকি খরচসংক্রান্ত বিল-ভাউচার দেখতে চাইলে সেভাবে কোনো দলিল অফিসে পাওয়া যায়নি।

(চ) পুরোনো সম্পর্কের জের টানা : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অনেক সময়ই বলেন, 'আপনার সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক ভালো, আবেদন করে তথ্য নেবেন কেন?' যেহেতু আবেদনকারী কোনো এনজিও-প্রতিনিধি বা এলাকার সাংবাদিক, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ পুরোনো সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অজুহাত সৃষ্টি করছে।

(ছ) আইনের প্রশংসা করছে কিন্তু এর বিধানের প্রতি আস্থা কম : অনেক কর্তৃপক্ষ আইনটিকে একটি ভালো উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এতে তথ্য প্রদানসংক্রান্ত যেসব বিধান রয়েছে, তার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। অনেক তথ্য নিয়েই তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। তারা মনে করছে, সরকারের এসব তথ্য জনগণের জানার প্রয়োজন নেই।

(জ) অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা : সমাজসেবা অফিসে তথ্য চাইলে বলছে, নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে, জেলাতে তথ্য চাইলে বলছে উপজেলায় চাইতে। স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যের ক্ষেত্রে আরও বিভ্রান্তি। স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকর্তা দেবেন, নাকি পরিবার পরিকল্পনা থেকে দেবে—তা নিয়েও অনেক দ্বিধা রয়েছে কর্তৃপক্ষের।

(ঝ) আবেদনপত্রে উল্লিখিত মাধ্যমে তথ্য না দেয়া : তথ্য অধিকার আইনের আবেদন ফরমে উল্লেখ করার সুযোগ আছে, কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী, সেটা ফটোকপি, লিখিত ও পরিদর্শন হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিখিত বা কম্পিউটার প্রিন্ট অবশ্যই তথ্যটিকে অনির্ভরযোগ্য করতে পারে। যেমন, আবেদনপত্রে কোনো একটি জেলার গণপূর্ত প্রকৌশলী অধিদপ্তরের কাছে একটি নির্দিষ্ট ভবনের টেন্ডার ওপেনিং শিট ও ওয়ার্ক অর্ডারের ফটোকপি চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট দেন, যা নির্ভরযোগ্য নয় বলে আবেদনকারী মনে করছেন।

(ঞ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া : অনেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কাছে আবেদন না করে ওই কার্যালয়ের প্রধানের কাছে আবেদন করেছেন, যা আসলে পরবর্তী সময়ে তথ্য কমিশনের অভিযোগ বাছাই করে বাদ দেয়া হয় ত্রুটিপূর্ণ আবেদনের কারণে।

(ট) আপিল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্টকরণ : আপিল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে নির্দিষ্টকরণের অভাবে অনেক তথ্য অভিযোগই আমলে আসেনি। অনেক কর্তৃপক্ষের স্থানীয় পর্যায়ে অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকার কারণে মন্ত্রণালয় বা বিভাগে আপিল করতে হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ের একজন আবেদনকারীর জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত দায়িত্ব মনে হয়েছে।

(ঠ) তথ্য কমিশনের অভিযোগ বাছাই-প্রক্রিয়া : ২০০৯ সাল থেকে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১০৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে ৪১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত, ত্রুটিপূর্ণ আবেদনের কারণে ৬০টি অভিযোগ বাতিল করা হয়েছে। এখানে

উল্লেখ্য, কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ থেকে দেখা যায় যে ২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তির মধ্যে ৭টি অভিযোগই নিষ্পত্তি হয়েছে উৎপল খীসা নামের একজন ব্যক্তির (তথ্য কমিশন প্রতিবেদন। এবং ২০১০ সালের প্রতিবেদনেও দেখা যায় একজন সউদ খানের ৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। অভিযোগ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

(ড) অভিযোগকারির ঢাকায় আসা : এ উদ্যোগের বেশ কিছু সাংবাদিক তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছেন। তারা সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, শুনানিতে ঢাকায় একের অধিকবার আসার প্রয়োজন হতে পারে, এক্ষেত্রে অফিস থেকে ছুটি ও খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন : ২১ এপ্রিল ২০১২

ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন (Central Information Commission) সুপারিশ করেছে, একই ব্যক্তির একাধিক তথ্য আবেদনে সীমা নির্ধারণ করা উচিত। এতে করে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে তথ্য কমিশনের অনেক লম্বা সময় লেগে যাচ্ছে। ২০১১ সালের শেষে ১.০৭ লাখ অভিযোগ অনিষ্পন্ন থেকে গেছে। তথ্য কমিশন অনুসন্ধান করে দেখেছে, একই বিষয় নিয়ে একই ব্যক্তি বিভিন্ন বিভাগে তথ্য চেয়েছেন, পরে আপিল ও অভিযোগ করেছেন, যা তথ্য কমিশনের কার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করার এটি একটি কারণ বলে তারা চিহ্নিত করেছে ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে।

সুপারিশ ও মন্তব্য

তথ্য কমিশনের কাছে

১. আপিল কর্তৃপক্ষ বিষয়ে অস্পষ্টতা দূরীকরণে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা প্রয়োজন।

২. সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধায়কের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে।

৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এই আইনের অন্যতম মূলনীতি। প্রতিটি কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অবস্থার নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। তথ্য কমিশন এ বিষয়ে নিরিখ (অডিট) কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়নের গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন, যেখানে সত্যিকার অর্থে সেবার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তথ্য থাকবে।

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগ্যতা ও পদমর্যাদা সর্বনিম্ন কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৭. প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসহ সব তথ্য প্রদান ইউনিটের তথ্য সংরক্ষণের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দের ব্যাপারে প্রাক-বাজেট সুপারিশ প্রেরণ।

৮. উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক সচেতনতা একেবারেই নেই। এ ব্যাপারে কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থারও উদ্যোগ নেয়া উচিত এবং তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করে, এমন বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৯. 'চ্যাম্পিয়ন' অর্থাৎ ভালো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তথ্য প্রদান ইউনিটকে বার্ষিক ভিত্তিতে পুরস্কৃত করলে অন্যরা উৎসাহিত হবে।

কর্তৃপক্ষের জন্য

১. তথ্য চাহিদাকারীকে প্রতিপক্ষ মনে করে নয় বরং তথ্য প্রকাশের সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেন।

২. তথ্য আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে আপনার ইউনিটের তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি হচ্ছে, এ বিষয়টা আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে।

৩. আইনের বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৪. স্ব-উদ্যোগে বেশি বেশি তথ্য প্রকাশ করলে তথ্যের চাহিদা থাকবে না, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বের চাপ কমবে।

৫. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তত্ত্বাবধানের বাড়তি সময় প্রদানের প্রয়োজন হবে না।

৬. প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকলেই তা গ্রহণ করা, কারণ ধারণাগত অভাবের কারণে অনেক সময় কমিশন পর্যন্ত যেতে হতে পারে।

তথ্য আবেদনকারীর জন্য

১. তথ্য অধিকার আইনটিকে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নয়।

২. আবেদন করার জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো বেছে নিন, তাহলে দেখবেন আপনার পাশে অনেকেই আছে।

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বা তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিপক্ষ না ভাবা।

৪. যদি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তথ্য প্রদান করতে চায়, সে ক্ষেত্রে নমনীয় থাকতে পারেন। এতে করে তার সদিচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫. তথ্য প্রদানকারীও একজন মানুষ, তার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করুন আপনার বিবেক দিয়ে, প্রয়োজনে আপনার আবেদনকে একটু সহজ করে দিন।

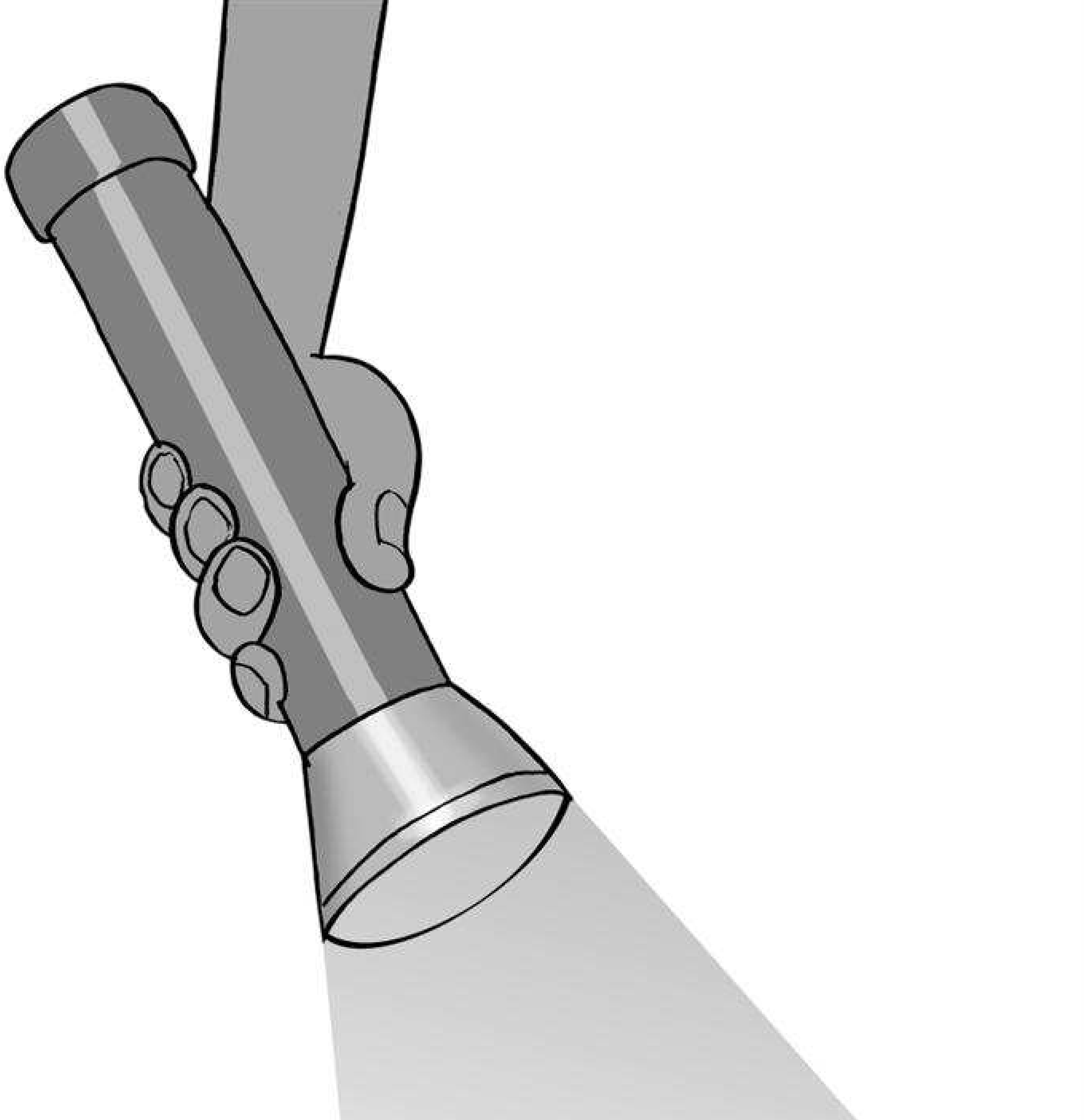

চতুর্থ অধ্যায়

নতুন প্রাপ্তি: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিদেশি সাহায্যপুষ্ট সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয়।

একটি দেশে নাগরিকের তথ্য অধিকার থাকা মানে দেশটির সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তরিক ও সাহসী। ২০১১ সালের ৭ নম্বর আইনটি আরও একটি সাহসী পদক্ষেপ। আইনটি হলো জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১। এই আইনের মাধ্যমে মূলত সকল কর্তৃপক্ষকে একধরনের রক্ষাকবচ দেয়া হয়েছে এবং ক্ষমতায়নও করা হয়েছে, অর্থাৎ জনগণের চাহিদা বা দাবির ভিত্তিতে তথ্য প্রদান করা তো যাবেই এবং নিজ উদ্যোগেও জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্মুক্ত করা যাবে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন দুর্নীতি-হ্রাসের একটি উপায়, অপরটি হচ্ছে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ আপামর জনগণের নৈতিকতার মান উন্নয়ন। দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ব্যক্তির সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে দুর্নীতির চর্চা কমে আসে। সরকারি কর্মকাণ্ডের যেসব ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতার কারণে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি দুর্নীতি হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের দুর্বলতা আলোচনাকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ (ধারা ৩১) একটি ধারার সমালোচনা ছিল। এই ধারায় তথ্য প্রদায়কের সুরক্ষার কথাই বলা হয়েছে কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট নয়। এই সুপারিশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফোরামে নাগরিক সমাজের সেমিনারে আলোচনায় এসেছে। শুরু থেকে তথ্য অধিকার আইনেই তথ্য প্রদায়কের সুরক্ষার বিষয়টির দাবি ছিল এনজিও প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে।

জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিধান এই আইনে দেয়া হয়েছে। এই আইনেও বর্ণিত সংস্থা বলতে তথ্য অধিকার আইনে বর্ণিত সব কর্তৃপক্ষকেই বোঝানো হয়েছে।

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য কী

- সরকারি অর্থের অনিয়ম ও অননুমোদিত ব্যয়;
- সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা;
- সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয়;
- ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা;
- ফৌজদারি অপরাধ বা বেআইনি বা অবৈধ কার্য সম্পাদন;
- জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ।

জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ

কোনো তথ্য প্রকাশকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যুক্তি বিবেচনায় নিয়ে উপরিউল্লিখিত তথ্য প্রকাশ করতে পারবে।

তথ্য প্রকাশকারীর কী ধরনের সুরক্ষার কথা আইনে বলা হয়েছে[২৬]—

১। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রকাশকারী ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া তার পরিচিতি প্রকাশ করা যাবে না।

২। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো বিভাগীয় মামলা করা যাবে না।

৩। চাকরিজীবী হলে এ কারণে তার পদাবনতি, হয়রানিমূলক বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান বা এমন কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, যা তার জন্য মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে হানিকর।

৪। কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থা বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

৫। প্রকাশিত তথ্য কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় সাক্ষ্য হিসেবে বা ওই ব্যক্তিকে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৬। মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত কোনো বই, দলিলে যদি ওই ব্যক্তির নাম বা পরিচয় থাকে, তাহলে আদালত কোনো ব্যক্তিকে ওই নথি বা দলিল পরিদর্শনের অনুমতি দেবেন না।

৭। ওই ব্যক্তি পুলিশ বা অন্য কোনো তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন কিন্তু তার শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন কিছুতে তাকে বাধ্য করা যাবে না।[২৭]

তথ্য প্রকাশকারীর তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য প্রকাশকারীকে যথাযথ পুরস্কার ও বা সম্মাননা প্রদান করার বিধানও রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করা হলেও আইনে দণ্ডের বিধান রয়েছে। মিথ্যা হয়রানিমূলক তথ্য প্রজাতন্ত্রের কার্যক্রমকে বিব্রত করবে এবং এতে করে সরকারি প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা হারাবে। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য এই আইনে দণ্ডের বিধান রয়েছে।

প্রকাশিত তথ্য যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যা বা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট না হয়, এমন প্রমাণিত হলে ওই তথ্য প্রকাশকারীকে এই আইনের অধীনে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য ন্যূনতম ২ (দুই) বছর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

[২৬] ধারা-৫, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

[২৭] ধারা-৭, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

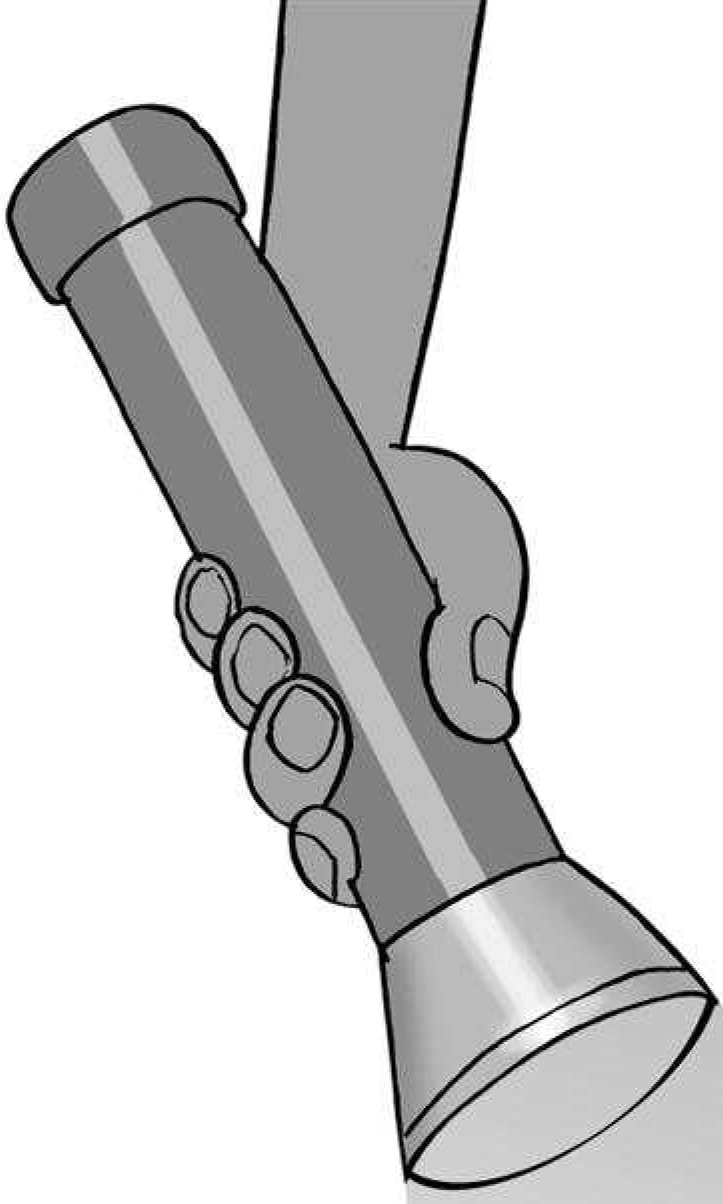

পঞ্চম অধ্যায়

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

তথ্যের দাম ৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা!

আসাদ আসাদুজ্জামান, নির্বাহী সম্পাদক, গ্রামের কাগজ, যশোর

যশোরের জেলা প্রশাসন মাত্র দুটি তথ্যের খরচ বাবদ আমার কাছে ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৪ টাকা দাবি করেছিল, যা শুনে আমার *গ্রামের কাগজ* সম্পাদক জনাব মবিনুল ইসলাম মবিন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমার পত্রিকা বিক্রি করে তথ্য কিনতে হবে!' আর এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে কথা বললে এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর বললেন, 'হয়তো আপনাকে তথ্য দিতে চায় না, তাই এমন অযৌক্তিক মূল্য চাইছে। আপনি তথ্যের মূল্যের লিখিতভাবে দিতে বলেন। দেখেন কী বলে?' সেই লিখিত চিঠি ওরা আমাকে দেননি। তবে সেই একই তথ্য পেয়েছিলাম মাত্র ১৩০০ টাকা খরচ করে। ঘটনা ব্যাখ্যা করা জরুরি।

বিগত ২০১১ সালের জুলাই মাসে ইউএসএআইডি প্রগতি ও এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইনের ওপর যশোরে *গ্রামের কাগজ*-এর একটা 'ইন হাউজ ট্রেনিং' করায়। ওই ট্রেনিংটা আমার জন্য শুধু উপকারেরই ছিল না, ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ট্রেনিং কাজে লাগাতে বলা চলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওই ট্রেনিংয়ের তথ্য কমিশনের বার্ষিক রিপোর্টের কপি আমাদের দেয়া হয়েছিল। ছোট্ট একটি তথ্য আমার মনে খটকা সৃষ্টি করল। তথ্যটি হলো, 'তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর যশোরে ৪,৫০১টি তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।' যশোরের মানুষ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এত সচেতন কীভাবে হলো, আর প্রশাসনই-বা এত কী সেবা দিল, তা জানার আমার কৌতূহল জাগল। সে কৌতূহল থেকে ১৯ জুলাই ২০১১ যশোর জেলা 'তথ্য বাতায়নে'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে এই প্রদেয় ৪,৫০১টি তথ্যের খতিয়ান চেয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলাম। একই দিন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসে কাবিখা, টিআর, কাবিটা ইত্যাদি প্রকল্পের কাজের তালিকা চেয়ে আবেদন করলাম। কিন্তু এ দুটো আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময়ই প্রথম ধাক্কাটা খেলাম। দরখাস্ত জমাগ্রহণকারী ই-সেবা কর্মচারী মিসেস ইলোরা মার্টিন আমার আবেদনপত্র দুটি নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'উপরে বরাবর জেলা প্রশাসক কথাটা লিখতে হবে।' আমি বিনয়ের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের গেজেট থেকে তথ্য আবেদন করার নমুনা ফরম দেখালাম। তবুও তিনি মানতে নারাজ। তিনি বললেন, 'এমন দরখাস্ত জীবনে দেখিনি!' একপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব নাহিদুল মোস্তাকের নির্দেশে ইলোরা মার্টিন আবেদনপত্র দুটি রিসিভ করলেন।

শুরু হলো আমার দ্বিতীয় অধ্যায়—হাঁটাহাঁটি। ১০ কার্যদিবস পরে যোগাযোগ করলাম মিসেস ইলোরা মার্টিনের সঙ্গে। তিনি বললেন, আমার তথ্য পাশের কক্ষে 'তথ্য প্রদান কেন্দ্রে' পাওয়া যাবে। গেলাম সেখানে। সেখানকার কর্মচারী আসাদুজ্জামান বললেন, 'আপনার ফাইল এডিসি জেনারেল স্যারের টেবিলে।' গেলাম তৎকালীন এডিসি জেনারেল বাবু সঞ্জয় কুমার বণিকের অফিসে। আমার পরিচয় দিয়ে আবেদনপত্রের রিসিভ কপি দেখাতেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এসব

তথ্য নিয়ে আপনি কী করবেন?' আমি বললাম, 'আমার পেশাগত কাজে লাগবে।' তিনি আবারও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার নামে চিঠি যাওয়ার পর দেখা করবেন।' আমি রোজ চিঠির অপেক্ষায় ঘুরতে লাগলাম।

১৮ কার্যদিবসের দিন আমার মোবাইলে ফোন দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শরীফ নজরুল ইসলাম। তিনি বললেন, তার চেম্বারে দেখা করতে। আমি দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমার তথ্যের খরচ কয়েক লাখ টাকা পড়বে। এ নিয়ে চিঠিও ইস্যু হচ্ছে। 'একজন সাংবাদিক এত টাকা কোথায় পাবে!' বলে তিনি আমাকে চিঠি ইস্যুর আগে এডিসি জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। আমি ভয়ে ভয়ে(!) ঢুকলাম এডিসি জেনারেল বাবু সঞ্জয় কুমার বণিকের কক্ষে। দেখলাম, আমার আবেদনপত্রের ফাইলটি অনেক মোটা হয়েছে। টেবিলের পাশে ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব নাহিদুল মোস্তাক। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, এত টাকা একজন সাংবাদিকের দিয়ে তথ্য নেয়ার ক্ষমতা নেই। আমাকে দেখে রীতিমতো রেগে গেলেন এডিসি জেনারেল। তিনি বললেন, 'এত তথ্যের যখন দরকার, দেন চিঠি করে। আপনি চিঠি নিয়ে যান। কাল ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৪ টাকা দিয়ে তথ্য নিয়ে যাবেন।' আমাকে নিয়ে নাহিদুল মোস্তাক সাহেব বেরিয়ে এলেন। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, সাধারণ তালিকা নিতে এত খরচ পড়বে কেন! তিনি বললেন, 'শুধু তালিকা হলে কি আপনার হবে?' আমি বললাম হবে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, কাল আসেন। দেখি, আপনার জন্য কী করা যায়।'

আমি বিমর্ষ অবস্থায় *গ্রামের কাগজ* অফিসে এসে বিস্তারিত বললাম সম্পাদক মবিন ভাইকে, পরে ঢাকায় মুকুর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। তিনি অনেক পরামর্শ দেয়ার পর বললেন, 'আপনি তথ্য নেবেন কি নেবেন না, পরে দেখা যাবে। আপনি আগে ওদের কাছ থেকে ৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকার চিঠিটা নেন।'

পরদিন গেলাম ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদুল মোস্তাকের কাছে। বললাম, আমাকে চিঠিটাই দেন। কিন্তু তিনি আর চিঠিটা দিলেন না। মিষ্টি স্বরে বললেন, 'চিঠি নিয়ে কী করবেন? খামোখা ঝামেলা আরও বাড়বে। তার চেয়ে ম্যানুয়াল তালিকা রয়েছে, সেটা নিয়ে যান। ওর খরচ বেশি পড়বে না।' আমি চিঠিটা পাওয়ার জন্য অনেক ধরনের কথা বললাম। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। অগত্যা, ম্যানুয়াল ফটোকপি নিয়ে ১৩০০ টাকা খরচ দিলাম।

তবে মুকুর ভায়ের ট্রেনিংয়ের একটা পরামর্শ কাজে লাগালাম। আমি ফাইল দেখতে চাইলাম। সেখানে আমার ফাইলে দেখলাম, ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ সুলতানা স্বাক্ষরিত হিসেবে আমার ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৪ টাকার হিসাব। যার উপরে লেখা আছে 'টেলিফোনের মাধ্যমে ডিআরআর ও অফিস থেকে উপজেলাওয়ারি খরচের তথ্য নিম্নরূপ'। নিচে লেখা আছে সদর উপজেলা ১ লাখ ৬০ হাজার, অভয়নগর ৩০ হাজার, বাঘারপাড়া ৫০ হাজার, চৌগাছা ৩৫ হাজার, ঝিকরগাছা ৩৫ হাজার, কেশবপুর ৩০ হাজার, মনিরামপুর ৭০ হাজার, শার্শা উপজেলা ৬০ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ই-সেবা থেকে ৪,৫০১টি গুণ ৪ টাকা = ১ লাখ ৮০ হাজার ৪ টাকা। সব মিলিয়ে ৪,৮৮,০০৪ টাকা।

১৩০০ টাকার ফটোকপি করে তথ্য নিয়ে যা পেলাম তা আরেক বিস্ময়! তবে শুরুতে যা আঁচ করেছিলাম, তা-ই পেলাম। জেলায় যত ই-সেবা প্রদান করা হয়েছে, তা-ই তথ্যসেবা বলে চালানো হয়েছে। তালিকায় পেলাম, কবে কাকে জমির পরচা, দলিল, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর

ইত্যাদি দেয়া হয়েছে তার বিশাল খতিয়ান। আমার ধারণা, এটি হয় 'তথ্য অধিকার আইনের তথ্য কাকে বলে' তা না বুঝে করা হয়েছে, নয়তোবা নিজেদের 'ক্রেডিট' নিতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারের আশায় ই-সেবাকে তথ্যসেবা হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে *গ্রামের কাগজ*-এ একটা চমৎকার রিপোর্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্পাদক মহোদয় বললেন, 'বাদ দেন। প্রশাসনকে চটিয়ে লাভ নেই।'

'তথ্য অধিকার আইন' বিষয়ে যতটুকু শিখতে পেরেছি তা প্রয়োগ করে শুধু ভালো ভালো রিপোর্টই করিনি, এখনো করছি। শুধু তা-ই নয়, অনেক সরকারি কর্মকর্তাকে এ আইন শেখাতেও হচ্ছে। এ আইন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বেশ মজাও পাচ্ছি। তবে সমস্যাও অনেক। অতিপরিচিত লোকজন, যারা কিছুদিন আগেও দেখা হলে এক গাল হেসে কুশল বিনিময় করতেন, তারা এখন দেখেও না দেখার ভান করেন। ফোনও আগের মতো ধরেন না। আর একেবারে সামনাসামনি দেখা হলে 'আসাদ সাহেব ভালো তো?' বলে যে হাসিটি হাসেন তা 'আরষ্ট হাসি'। সে হাসিতে কোনো প্রাণ থাকে না।

'আরটিআই প্রয়োগ করলে কেউ আপন, কেউ পর হবে'

যদি হয় প্রয়োগ, তাহলে দেশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন নিশ্চিত হবে

হিমেল চাকমা, রাঙামাটি প্রতিনিধি, দৈনিক সকালের খবর

তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) প্রয়োগ করলে কেউ আপন হবে, কেউ পর হবে। কিন্তু যদি ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দেশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন নিশ্চিত হবে। আরটিআই নিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (এমআরডিআই) এবং ইউএসএআইডি প্রগতির কাছে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ অনুযায়ী আরটিআই প্রয়োগ করে আমার এই উপলব্ধি।

যেভাবে আরটিআই জানা

২১ জুন ২০১১ রাত প্রায় ১০টা। কর্মস্থল *দৈনিক সকালের খবর* অফিস থেকে ফোন আসে। কল রিসিভ করে জানলাম, মফস্বল সম্পাদক তরিকুল ইসলাম। তরিকুল ভাই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, 'হিমেল, তোমাকে ২৪ জুন অবশ্যই ঢাকায় আসতে হবে। কারওয়ান বাজারের একটি হোটেলে তোমাদের কয়েকজনের ২৫-২৬ জুন দুই দিন কর্মশালা হবে। এলে বিস্তারিত কথা হবে।' বলে ফোন রেখে দেন।

কর্মশালায় অংশ নিলাম। এতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের ২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। আরটিআই নিয়ে পরপর দুই দিনের কর্মশালা। এই কর্মশালায় হাতে-কলমে আরটিআই সম্পর্কে শেখানো হয়। কর্মশালা শেষে রাঙামাটি ফিরলাম। কর্মশালায় যা শিখেছি তা নিয়ে আরটিআই প্রয়োগ করতে একটি আবেদনপত্রও প্রস্তুত করি। এটির শুদ্ধতা যাচাই করতে এমআরডিআইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফারহানা আফরোজের কাছে মেইলে পাঠালাম। তিনি ভুলগুলো ঠিক করে দিলেন। কিন্তু আবেদন করতে গিয়ে কেমন যেন ভয় হয়। কারণ আমি তখন নতুন এবং খুদে সংবাদকর্মী। দেখি, যার কাছে আমি তথ্য চেয়ে আবেদন করব, সেই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সিনিয়রদের বেশ ভালো সম্পর্ক। যাক, ভয়ে এই আবেদন করা হলো না।

এভাবে প্রায় ছয় মাস চলে গেল। ১৫ জানুয়ারি ২০১২ আবারও অফিস থেকে ফোন। আমি সৌভাগ্যবান, অফিস আবার আমাকেই মনোনীত করেছিল। ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০১২, দুই দিন ঢাকায় কর্মশালার কথা এবং যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার কথা জানাল অফিস। এর মধ্যে এমআরডিআই থেকে একটি চিঠি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধিমালা ও প্রবিধানমালা পাঠানো হয়।

কর্মশালা থেকে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, নিজ এলাকায় এসে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করব। যেমন প্রতিশ্রুতি তেমন কাজ।

অভিযান যেভাবে শুরু

কর্মশালা শেষে রাঙামাটি ফিরেই রাঙামাটি জেলা পরিষদের ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে আবেদন করলাম। তা হলো; ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম (পা. চ.) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ পত্র নং-২৯.২২৩.০২০.০০.০০.০১৩.২০১০-৩০৯ তারিখ ১৫/০৯/২০১১ খ্রি. বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি আওতায় রাঙামাটি জেলা পরিষদে কত মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে? খ) মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর অনুযায়ী বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যগুলো কোনো ধরনের প্রকল্পে ব্যয়ের কথা উল্লেখ আছে? প্রকল্পগুলোর নাম জানতে চাই। ঘ) প্রকল্পগুলো বিলি-বন্টনের জন্য জেলা পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কি না। দেওয়া হলে কোন উপজেলায় কোন সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের নামের তালিকা এবং প্রকল্পের নাম? ১৩ দিনের মধ্যে এই তথ্য পেলাম। অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে তথ্য দেওয়া হয়।

আমি দেখলাম, আবেদনে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে গেছি। এই তথ্য প্রতিবেদনের কোনো কাজে না এলেও এর ওপর ভিত্তি করে আরও তথ্য চেয়ে আবেদনে বেশ সাহায্যে করল।

এর ওপর ভিত্তি করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে তথ্য চেয়ে জেলা পরিষদে আরও একটি আবেদন করি। তা হলো; ক) পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দপত্র নং ২৯.২২৩.০২০.০০.০০.০১৩.২০১০-৩০৯ তারিখ ১৫/০৯/২০১১ খ্রি. বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচির আওতায় জেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১,৩০০ (এক হাজার তিন শত) মে. টন চাউল এবং ৪০০ (চার শত) মে. টন গম মোট কয়টি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে? খ) উক্ত বরাদ্দপত্র অনুযায়ী রাঙামাটি জেলা পরিষদের সদস্যদেরও নাম উল্লেখ করে নিজ নিজ উপজেলাভিত্তিক কে কত মে. টন চাউল এবং কত মে. টন গম বরাদ্দ পেয়েছে? গ) এসব খাদ্যশস্য কে এবং কী পরিমাণ বরাদ্দ পেয়েছে? প্রকল্প পরিচালনাকারী/ভোগীদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও ঠিকানা। কোন প্রক্রিয়ায় বরাদ্দ পেয়েছে?

এই তথ্যের জন্য আমাকে আপিল করতে হয়। আপিলের নির্ধারিত সময়ের এক দিন আগেও কোনো উত্তর নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার আমাকে কমিশনে অভিযোগ করতে হবে। সব প্রস্তুতি শেষ। অভিযোগ করব। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় আপিলের পর নির্ধারিত সময়ের শেষ এক দিনের আগে তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি আমার ফোন পেয়ে বেশ খুশি হন এবং চেয়ারম্যানের হয়ে তিনি আমার কাছে এক সপ্তাহ সময় চান। আমি রাজি হলাম। ঠিক সপ্তাহের পর আমাকে তথ্য কর্মকর্তা জানান, আবেদিত তথ্যগুলো প্রস্তুত হয়েছে। তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে। আমি গিয়ে সেগুলো আনলাম। এখন এগুলো নিয়ে মাঠে গিয়ে কাজ করতে হবে, আমি সুন্দর একটি রিপোর্টের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

আরটিআই প্রয়োগ করলে কেউ আপন, কেউ পর হবে

জেলা পরিষদে আমার প্রথম আরটিআই প্রয়োগ। পরের আবেদনটি আমি রাঙামাটি ডিসি অফিসে ইটভাটা-সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে করি। এ ছাড়া আরও দুটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য চেয়ে আবেদন করি। এগুলো প্রক্রিয়াধীন আছে। এতেই আমি বুঝলাম, এসব প্রতিষ্ঠানে আরটিআই প্রয়োগ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কেউ আপন, কেউ পর হবে! আমি জানি, ডিসি অফিসের সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামের সঙ্গে আমার আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু যখন আমি তার কাছে তথ্য আবেদন করি, তখন থেকে তিনি আমার কাছ থেকে বেশ দূরে সরে যান। অন্যদিকে জেলা পরিষদের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অরুণেন্দু ত্রিপুরার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না হলেও আরটিআই প্রয়োগের পর তিনি আমার একজন প্রিয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তার কাছে আমি যে জিনিসটি দেখেছি, তা হলো—আমি যে তথ্য জানতে চাই তিনি তার চেয়েও বেশি তথ্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আমার তথ্য পেতে আপিল পর্যন্ত করতে হয়। এই ক্ষেত্রে তার কোনো ক্রটি বা উদাসিনতা লক্ষ করিনি। তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখার বিষয় অনুভব করি। তিনি তার হৃদয়ে জমে থাকা ক্ষোভের কথা বলেন এবং আমাকে অভয় দেন, 'আপনি যা জানতে চান আমার কাছে আসেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খারাপ কোনো কিছু দেখলে নিউজ করেন। চেয়ারম্যান সাহেব যদি এই নিউজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিখতে বলেন, তাহলে আমি প্রতিবাদ লিখে দেব। তবে আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হবে না।'

তথ্য চেয়ে আবেদনের আগে এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও নিজস্ব গবেষণা সচল রাখা প্রয়োজন

রাঙামাটি জেলা পরিষদে আবেদনের আগে চিন্তা করেছিলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'রাবার বাগান প্রকল্প' নিয়ে আবেদন করব। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম। প্রাথমিক ধারণা না থাকায় আমি মনে করেছি, এখানে গোপন অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। এর জন্য আমি কয়েকটি প্রশ্ন প্রস্তুতও করেছি। যেগুলো আমি জানতে বেশ আগ্রহ বোধ করি। এই প্রশ্নগুলো সঠিক কি না, তা জানতে গিয়ে রাবার বাগানের ভুক্তভোগী এবং এই রাবার নিয়ে যারা গবেষণামূলক বই লিখেছেন, তাদের কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। আরটিআই প্রয়োগ করতে হলো না। আমি যে ধারণা করেছি তার সঙ্গে মিল নেই। আমি যা সন্দেহ করেছি তা সঠিক কিন্তু তা অনেক পুরোনো। যারা এসব করেছে তারা অধিকাংশ অবসরে গেছেন, কেউ মৃত্যুবরণও করেছেন। এসবের দায় বর্তমানে যারা আছেন তারা নিতে পারেন না। তার পরেই আমি চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বাদ দিয়ে জেলা পরিষদে আবেদন করি।

আরটিআই প্রয়োগ করলে তথ্য পাওয়া যাবে

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু জেনেছি: তা হলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আইনের অধীন যেকোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়ম অনুযায়ী তথ্য চেয়ে আবেদন করলে তথ্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। তার আগে অবশ্যই আইন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকতে হবে। এ কথা আমি এ কারণে বলছি, আমি যখন ডিসি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে রাঙামাটি জেলার ১০টি উপজেলায় জেলা প্রশাসনের আওতাধীন ইটভাটা-সংক্রান্ত তথ্য, যেমন—আইনগত বৈধতা এবং ওই আইন/নীতিমালার কপি, ইটভাটা স্থাপনের শর্ত, ইটভাটা স্থাপনের ব্যাপারে পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরের কোনো নীতিমালা আছে কি না—এই তথ্যগুলো চেয়ে আবেদন করি।

শফিকুল ইসলাম বেশিরভাগ তথ্যের উত্তর দিতে রাজি নন। তিনি আমার আবেদনের ১০ দিন পর আমাকে মুঠোফোনে এই কথা জানান। তিনি আমাকে বলেন, শুধু কোথায় কয়টি ইটভাটা আছে, এটা ঠিক আছে কিন্তু বাকিগুলো—এই তথ্য চাওয়ার অর্থ হলো তাকে হয়রানি করা! অফিসে গিয়ে আমি তাকে বললাম, আপনি যেহেতু এগুলো দিতে চাচ্ছেন না, তাহলে আমাকে বিধিমালা ও প্রবিধানমালার 'গ' ফরম অনুযায়ী লিখিত দিন। এ কথা বলার পর তাকে কিছুটা রাগান্বিত দেখা যায়। তিনি আমাকে বলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার আন্তরিকতার স্বার্থে আপনাকে আমি এই মহূর্তে 'ক' নম্বর উত্তর দিতে চাচ্ছি। আপনি নিচ্ছেন না!' এই কথা বলে তিনি তার একজন পিয়নকে বললেন, 'যাও, তথ্য অধিকার আইনের বইগুলো নিয়ে আসো।' হুকুম অনুযায়ী পিয়ন দুটি বই আনে। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে হতাশার মুখে আমাকে বলেন, 'সরকার আইন করে আর কি। আইন করলে কী হবে, বাস্তবায়ন তো হয় না।' তিনি আমাকে প্রশ্ন করে বলেন, 'সরকার কী না করতে পারে, আমাকে বলেন?' উদাহরণ দেন, সরকার চাইলে একজন আসামির জামিন হয়, না চাইলে জামিন হয় না।' আমি বললাম, এগুলো তো হয়। যাক, আপনি আমাকে এই তথ্যগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, না হলে আমি আপিল করব। এই কথা বলার পর তাকে বেশ বিমর্ষ দেখাল।

নির্ধারিত সময়ে ২৩ এপ্রিল আমাকে যথারীতি তথ্য দেওয়া হলো। উত্তরটি হলো এই, এককথায় রাঙামাটিতে কোনো ইটভাটা নেই। যদি থাকে, তাহলে সবগুলো অবৈধ। এই উত্তর পাওয়া গেলে বাকি উত্তরগুলোর জানার প্রয়োজন নেই। যদিও শফিকুল ইসলাম প্রথমদিকে জেলায় কয়টি ইটভাটা আছে তা দিতে রাজি হয়েছিলেন।

এতে আমি দেখেছি, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শফিকুল ইসলামের মতো কর্মকর্তারা হয়রানি করবেন। যদিও তারা নিজেরা এই আইন সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ নন।

আবেদন করে বসে থেকে তথ্য পাওয়া না গেলে নেতিবাচক চিন্তা করলে চলবে না

আমি দেখেছি, তথ্য চেয়ে আবেদন করার পর বসে থাকলে তথ্য পাওয়া যাবে না। শুধু আবেদন করে বসে থেকে তথ্য পাওয়া না গেলে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি নেতিবাচক চিন্তা করলে চলবে না। কারণ, অনেক সময় কাজের চাপে এগুলো চাপা পড়ে যায়। কাজের চাপে ভুলে গেলে সময়মতো তথ্য পাওয়া না গেলে নেতিবাচক চিন্তা করলে তা অবশ্যই ভুল হবে। আমার বেলায়ও তা হয়েছে। তৃতীয় বারের মতো জেলা পরিষদের একটি তথ্য চেয়ে আবেদনের পরে ১৫ দিনে

কোনো তথ্য না আসায় আমার মনে হলো, তথ্য কর্মকর্তা কি আমাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। পরে চিন্তা করলাম, এই বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে ভালো হয়। পরে দেখলাম, আমি যা সন্দেহ করেছি, তা সম্পূর্ণ ভুল।

আপিলের পর সময় দিতে হয়েছে

আপিলের পর আমাকে আপিল কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে এবং আপিল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমার কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন এবং তথ্য দিয়েছেন। নির্ধারিত সময় শেষে আমি কমিশনে অভিযোগ করলে পারতাম। কিন্তু তা করিনি, কারণ আমার তথ্য প্রয়োজন। কমিশনে গিয়ে আমি তথ্য পেতাম কিন্তু তা আরও সময়ের প্রয়োজন হতো।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন নিশ্চিত হবে

পরিশেষে আমি বলব, আমি ব্যক্তি হিমেল চাকমা। শুধু আমাকে আরটিআই প্রয়োগ করলে হবে না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আরও শত হিমেলের আরটিআই প্রয়োগ করলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন নিশ্চিত হবে। জনগণ অনেক কিছু জানতে চায়। কিন্তু এই জানতে চাওয়া শুধু মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে হবে না। আমি মনে করেছি, তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের নয়, এটি দেশের সব নাগরিকের। তাই এটি শুধু সাংবাদিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। জনগণ যদি এটি একটি অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ধরে নেয়, তাহলে দেশের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন নিশ্চিত হবে। তা না হলে শুধু আইনেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

তথ্য পেয়েছি, এখনো অনেক কাজ বাকি

সব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। তারা তথ্য দিয়েছে, আমি পেয়েছি। এই তথ্য নিয়ে আমাকে আরও বহুদূর যেতে হবে।

তথ্যের জন্য আইন প্রয়োগ

মোতাহার হোসাইন, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক গ্রামের কাগজ, যশোর

প্রসঙ্গ কথা

প্রতিদিন কোনো না কোনো সমস্যাকবলিত মানুষ সমস্যা নিরসনের ধারণায় সংবাদ প্রকাশের নির্ভরতায় ছুটে আসেন। সাংবাদিকতার ২৫ বছর পর তথ্য অধিকার আইন পেশাদারিত্বের পাশাপাশি যেন শিক্ষকতা করার সুযোগ করে দিয়েছে। সুযোগ বুঝে ছুটে আসা সমস্যা-আক্রান্ত মানুষের কাছে মাঝে মাঝে যেন তথ্য অধিকার আইনের শিক্ষক হয়ে উঠি। ২০০৯ সাল থেকে এমআরডিআই এ বিষয়ে আমাকে একজন ছোটখাটো শিক্ষক হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

একসময় সংবাদটিকে সমৃদ্ধ করতে তথ্য পাওয়ার ব্যাকুলতায় ছুটে গেছি সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা ব্যক্তির কাছে। কিন্তু দাপ্তরিক গোপনীয়তার আইন বা ওপরের নির্দেশনার কথাসহ বিভিন্ন অজুহাতে তথ্য না পেয়ে হোঁচট খেয়ে ফিরতে হয়েছে।

১৯৯৯ সালে *দৈনিক গ্রামের কাগজ*-এ যোগদানের পর তথ্য সংগ্রহে সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন ভাইয়ের বিভিন্ন কৌশল ও পেশাদার নির্দেশনা নিয়ে কাজ করতে থাকি। একবার পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে তথ্য না পেয়ে তথ্য পাওয়ার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে প্রয়াত শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক সাহেবের জনসংযোগ কর্মকর্তা সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় ড. মোহাম্মদ হান্নানের সঙ্গে আলোচনা করি। সেই সময়েই তিনি বলেছিলেন, পেশাদার সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার জন্য একটি আইনি অধিকার থাকা দরকার।

২০০৮ সালের ১ ও ২ নভেম্বর 'নির্বাচন ও রাজনৈতিক রিপোর্টিং' বিষয়ে *গ্রামের কাগজ*-এ দুই দিনের কর্মশালায় ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (এমআরডিআই) নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান মুকুর ভাইয়ের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখনো বুঝতে পারিনি, আমার প্রধান সমস্যা সমাধানে এমআরডিআই এত বড় সহায়ক হবে। এর ১১ দিন আগে ২০ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারি করা তথ্য অধিকার আইনের অধ্যাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশের কিছু ধারা-উপধারা সংযোজন-বিয়োজন করে বিল আকারে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদে যখন পাস করে, তখন পত্রিকায় পড়ে আইনটি আমার বোধগম্য হয় না।

ওই বছরের ১ জুলাই থেকে আইনটি কার্যকর হলে পত্রিকায় প্রকাশিত এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-নিবন্ধ নিয়ে সম্পাদক মবিন ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে থাকি। কিছুদিন পর মবিন ভাই আমাকে সুসংবাদ দিলেন, এমআরডিআই সেপ্টেম্বর মাসে *গ্রামের কাগজ*-এর সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। ২০০৯ সালের ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার নিয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণে এমআরডিআই ২৭২ পৃষ্ঠার একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ মডিউল দেন। তখনই আমি প্রথম চোখে দেখলাম তথ্য অধিকার আইন। আর সেটিই আমার রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই) বিষয়ক প্রথম পাঠ্য পুস্তক। ওই মডিউল পড়ে বুঝে উঠতে কষ্ট হলেও নির্বাহী সম্পাদক আসাদ আসাদুজ্জামানের সহযোগিতা নিয়ে ছোটখাটো রিপোর্ট করতে থাকি। ২০১০ সালের অন্য একটি কর্মশালায় মুকুর ভাই এসে *গ্রামের কাগজ*-এ প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আমার রিপোর্ট দেখে আমাকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন। সর্বশেষ গত ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় এ বিষয়ে এমআরডিআইয়ের দুই দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সম্পাদক মবিন ভাই আমাকে আরও একবার সুযোগ করে দেন।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সভাপতি নিযুক্তির পর থেকে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক হারে অভিযোগ আসতে থাকে। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধিরা অসহায়ত্ব ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেও বিরোধে জড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে সরাসরি অভিযোগ করতে অনীহা দেখান। জানতে পারি, অর্থ-বাণিজ্যে বিভিন্ন নিয়োগ বোর্ডে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা থাকলেও সব নিয়োগ বোর্ডে

একমাত্র অংশগ্রহণকারী ও নিয়ন্ত্রণকর্তা কেশবপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেখ ফিরোজ আহমেদ। নিয়োগসংক্রান্ত অভিযোগের কপি পেয়ে তথ্যের জন্য তার কাছে যতবার যাওয়া, ততবার তিনি প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা কমিটির সভাপতিকে দেখিয়ে এড়িয়ে গেছেন। অফিস সময়ে এ কর্মকর্তার দেখা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। নিয়োগসংক্রান্ত সব কাগজপত্র বা ফাইল তার নিয়ন্ত্রণেই থাকে। এ বিষয়ে অফিসের অন্যরা অন্ধকারে বলে নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারি। অফিস সময়ের পর তাকে অফিসে পাওয়া যায় বলে সোর্স জানায়। এ সময় ধরে অফিসে গিয়ে তাকে দেখা পেলেও প্রায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষক পরিবেষ্টিত থাকেন। নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নিয়েও তিনি ব্যস্ত থাকেন। তার প্রতি এলাকার এমপি ও সরকারি দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের পূর্ণ আশীর্বাদ রয়েছে বলে জানতে পারি। তাদের নির্দেশেই সব কলকাঠি নাড়েন তিনি। ফলে নিয়োগসংক্রান্ত কোনো তথ্য তার কাছ থেকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি দপ্তর থেকে বিভিন্ন অভিযোগ ও অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে খণ্ড খণ্ড রিপোর্ট করি। পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে আরটিআই প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিই।

তথ্যের আইনি লড়াই

তথ্য পাওয়ার আবেদনপত্র নিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিন দিন গিয়েও কেশবপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অফিসে না পেয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি ওই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে অফিস সহকারী রুহুল আমিনের কাছে যাই। তাকে আবেদনপত্রটি গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি তার কম্পিউটারে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মিনিট দশেক তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবেদনটি গ্রহণের পুনরায় অনুরোধ করি। তিনি আবেদনপত্রটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে রেখে দেন। আমি আরেকটি কপি এগিয়ে দিয়ে প্রাপ্তি স্বাক্ষরের কথা বললে তিনি জানতে চান, এটি কোন সংস্থা। আরও জানান, তিনি মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার কথা শুনেছেন কিন্তু তথ্য অধিকার নামে কোনো সংস্থার কথা শোনেননি। তাই স্মারক নম্বরবিহীন কোনো পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন না। পুনরায় নিজের পরিচয় দিয়ে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে কিছু বলে পত্রটি সরকারি গেজেটভুক্ত একটি ফরম উল্লেখ করলেও তিনি আবেদনটি ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'স্যার এলে স্যারের কাছে দেবেন।'

স্যারকে না পেয়ে আমি তিন দিন ফিরে যাওয়ার কথা বললে তিনি এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে স্যারের ব্যস্ততার কথা জানান। এ সময় উপস্থিত শিক্ষক ও অফিসে কর্মরত অন্যদের অনুরোধে তিনি আমার কপিতে প্রাপ্তি স্বাক্ষর করলেও সিল খুঁজে পান না। হযরত আলী নামে একজন স্টাফ প্রাপ্তি স্বাক্ষরের ওপর একটি গোল সিল মেরে দিয়ে পরে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন।

এসএসসি পরীক্ষায় ব্যস্ততার দোহাইয়ে স্যারের সাক্ষাৎ না পেয়ে ১০ কার্যদিবস পর মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম, আমার আবেদনপত্রটি স্যারের ডাকফাইলে দেয়া হয়েছে। তবে আবেদনে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে, ওই তথ্য স্যার ছাড়া অন্য কারও কাছে নেই বলে জানানো হয়। আমার ফোন স্যার রিসিভ না করায় অন্য একটি মোবাইল ফোন দিয়ে তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি। আমি আবেদন করার ১৮ কার্যদিবসে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে ফেরার পথে উপজেলা পরিষদ ভবনের নিচে সমাজসেবা দপ্তরের সামনে সিঁড়ির পাশে কর্মকর্তা সেখ ফিরোজ আহমেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখন আমার আবেদনটির ব্যাপারে জানতে চেয়ে বলি, তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারায় ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তিনি 'হবে নে, হবে নে' বলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কোনো জবাব বা তথ্য না পেয়ে ২৮ মার্চ নির্বাহী সম্পাদক আসাদ আসাদুজ্জামানকে সঙ্গে নিয়ে যশোর মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে আপিল আবেদন করি। জেলা শিক্ষা অফিসারের আন্তরিকতার সঙ্গে আবেদনটি রিসিভ করে সঙ্গে সঙ্গে অফিস সহকারীকে ডেকে পত্রটি তার হাতে দিয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য কেশবপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে পাঠাতে নির্দেশ দেন। এরই মধ্যে জানতে পারি, উপজেলা কর্মকর্তা সেখ ফিরোজ আহমেদ স্ট্যান্ড রিলিজ হয়েছেন। কয়েক দিন নবাগত শিক্ষা কর্মকর্তা ও অফিসে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, জেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে ওই ধরনের কোনো পত্র তারা পাননি। বাধ্য হয়ে ২৫ এপ্রিল প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ করি।

পরবর্তী কিছু কথা

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার তিন বছরের মধ্যে হাতেগোনা কিছু সাংবাদিক এ সম্পর্কে কেবল প্রাথমিক ধারণা নিয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পেশাদার সাংবাদিকদের এই আইন সম্পর্কে ভালো করে জানা উচিত। এই আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ তথ্য পাওয়া সম্ভব। তবে কখনো আইনটি অপপ্রয়োগ করা উচিত হবে না। এদিকে আইনটি এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিতি পায়নি। সরকারি কর্মকাণ্ড জনগণের জানার জন্য আইনটির ব্যাপক প্রচার এবং তথ্যদাতা সরকারি কর্মকর্তাদেরও এ সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

'আপনি কিন্তু তথ্য দিতে বাধ্য'

মনিরুল ইসলাম, জেলা প্রতিনিধি, প্রথম আলো, যশোর

'সরকারি চিঠিপত্রের ফটোকপি দেওয়া যাবে না। ইচ্ছে করলে দেখে যেতে পারেন।' বছর দুয়েক আগেও সরকারি কর্মকর্তাদের এ ধরনের বক্তব্য শুনে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পর কর্মকর্তারা বলেছেন, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করেন। আবেদন করার পর ওই কর্মকর্তারা আইনটি জেনে না-জেনে অদ্ভুত সব আচরণ করতে শুরু করেন। যা থেকে সাংবাদিকদের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে।

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (এমআরডিআই) নির্বাহী পরিচালক মুকুর ভাই ২০১১ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে মুঠোফোনে জানালেন, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক দুই দিনের প্রশিক্ষণ হবে। *প্রথম আলো* থেকে আপনার নাম পাঠানো হয়েছে। আপনি প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন। মুকুর ভাইয়ের নাম এর আগে অনেক শুনেছি।

সেদিন তার আমন্ত্রণ পেয়ে সত্যিই খুব আনন্দিত হলাম। দুই দিনের প্রশিক্ষণ থেকে নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার উন্মোচিত হলো।

প্রশিক্ষণ থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা পেলাম। এবং ওই প্রশিক্ষণ থেকেই একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় নির্ধারিত হলো। কোথায়, কীভাবে আরটিআই আবেদন করতে হবে তাও হাতে-কলমে জানিয়ে দেওয়া হলো।

এমআরডিআইয়ের ব্যবস্থাপক ফারাহানা আফরোজের আন্তরিক সহযোগিতায় যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য কয়েকটি তথ্য চেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার কাছে আবেদন করলাম। আবেদন জমা দেওয়ার দিন থেকে শুরু হলো তিক্ত অভিজ্ঞতা।

৮ ফেব্রুয়ারি আবেদন জমা দেওয়ার জন্য জেনারেল হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. সালাহ উদ্দীন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়কের পিএর কাছে ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর খবর এল, 'তিনি (তত্ত্বাবধায়ক) এখন ব্যস্ত। আপনাকে পরে আসতে বলেছেন।'

হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা কে, তা কেউ বলতে পারলেন না। পরে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল হামিদের কাছে আবেদনপত্রটি জমা দিয়ে এলাম।

ওই আবেদনে পাঁচটি বিষয়ে লিখিতভাবে তথ্য পেতে চেয়েছিলাম। তথ্যগুলো নিম্নরূপ :

ক. তিন মাসের অধিক সময় ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত চিকিৎসকদের নামের তালিকা ও অনুপস্থিতির কারণ;

খ. হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, শিশু ওয়ার্ড ও এক্স-রে বিভাগে পড়ে থাকা অকেজো যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানদের নামের তালিকা;

গ. এসব যন্ত্রপাতি মেরামত-সংক্রান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সর্বশেষ প্রতিবেদনের ফটোকপি;

ঘ. হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত ও সরকারি অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অতিরিক্ত কর্মচারীর তালিকা; এবং

ঙ. করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) খোলা-সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য।

নির্দিষ্ট সময় (২০ কার্যদিবস) পেরিয়ে গেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে কোনো সাড়া দেয়নি। এরপর ২২ মার্চ খুলনা বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এ কে এম আবদুস সামাদ মিয়ার কাছে এ-সংক্রান্ত আপিল আবেদন করি।

২৫ মার্চ পরিচালকের দপ্তর থেকে তথ্য প্রদানের জন্য হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠির অনুলিপি আবেদনকারীকেও দেওয়া হয়।

বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ড. এ কে এম আবদুস সামাদ মিয়ার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, *প্রথম আলো* যশোরের প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম তথ্য পাওয়ার জন্য হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত

তথ্য কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্যাবলি সরবরাহ করা হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

পরিচালকের চিঠি আসার ১৫ কার্যদিবস পরও তথ্য দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে এমআরডিআইয়ের ফারহানা আপার সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তার আগে তিনি তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কথা বলতে বলেন।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সালাহউদ্দীন আহমেদের কাছে তথ্য না দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তথ্য তো পাঠিয়ে দিয়েছি। 'আমার হাতে পৌছায়নি' জানাতেই তিনি বাহকের মাধ্যমে তড়িঘড়ি করে আংশিক তথ্য পাঠিয়ে দেন। হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত অতিরিক্ত কর্মচারীর তালিকা ও করোনারি ইউনিট (সিসিইউ) সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা হয়।

কেন পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়া হলো না—জানতে চেয়ে তত্ত্বাবধায়কের কাছে ১৫ এপ্রিল দুপুরে টেলিফোন করলে তিনি পুনরায় লিখিত আবেদন দেওয়ার পরামর্শ দেন। অথচ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল আবেদন করার নিয়ম। ইতিমধ্যে সে কাজটি করা হয়েছে।

'আপনি ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন' বলতেই তত্ত্বাবধায়ক সালাহউদ্দীন রেগে গিয়ে বলেন, 'আপনার কাছ থেকে আইন শিখতে হবে নাকি?' বলেই তিনি টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি খুলনা বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এ কে এম আবদুস সামাদ মিয়াকে মৌখিকভাবে জানানো হয়। পরিচালক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

পরদিন সিসিইউ-সংক্রান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সর্বশেষ প্রতিবেদনের ফটোকপি না দিয়ে আংশিক তথ্য *প্রথম আলো* যশোর কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

এদিকে ২৫ মার্চ সড়ক ও জনপথ বিভাগ যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলী জিয়াউল হায়দারের কাছে মৌখিকভাবে 'ঢাকা-খুলনা, যশোর-নড়াইল ও স্থানীয় তিনটি সড়কে সংস্কারকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সর্বশেষ চিঠির ফটোকপি পেতে চাই।

যথারীতি তিনি জানিয়ে দিলেন, 'সরকারি দপ্তরের চিঠির ফটোকপি দেওয়া যাবে না। আপনি দেখে যেতে পারেন।'

'তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করলে আপনি কিন্তু ওই চিঠির ফটোকপি দিতে আপনি বাধ্য'—এ কথার জবাবে নির্বাহী প্রকৌশলী বললেন, 'ওই আইনের কোন ধারায় এমন কথা লেখা আছে, সেটি আমাকে দেখান।'

পরদিন আইনের গেজেটটি নিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে গিয়ে গেজেটটি দেখানো হয়। এবং তাৎক্ষণিক তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়।

পাঁচ দিন পর তথ্য পাওয়া গেল। কয়েক দিন পর ঢাকা-যশোর-খুলনা মহাসড়ক ও যশোর-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল, সংস্কার করা হচ্ছে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আপনারা তো এখন আইন দেখিয়ে তথ্য চান। এত দিন কাজ শুরু করতে গড়িমসি করেছে। আপনার তথ্যসংক্রান্ত চিঠি দেওয়ার পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি সংস্কারকাজ শুরু করেছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য পাওয়া দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সাংবাদিকদের এত সময় নেই। যার জন্য সাংবাদিকেরা এ আইন প্রয়োগে কম আগ্রহী। আশার কথা হচ্ছে, আইন প্রয়োগ করি আর না করি, একটি অস্ত্র তো পাওয়া গেল। যে অস্ত্রের জোরে আমরা এখন সরকারি কর্মকর্তা-আমলাদের বলতে পারি, 'আপনি কিন্তু তথ্য দিতে বাধ্য'।

কোথায় তথ্য অধিকার

সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের ভাঙন, যমুনায় ড্রেজিং এবং জেলার রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ প্রসঙ্গ

গোলাম মোস্তফা জীবন, স্টাফ করেসপনডেন্ট, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দৃক নিউজ এবং রেডিও টুডে; সম্পাদক ও প্রকাশক, সাপ্তাহিক জীবন বার্তা

যে কারণে তথ্য চাওয়া

বিগত ২০০৯, ১০ এবং ১১ সালের বর্ষা মৌসুমে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধে পরপর কয়েক দফা ভাঙন সিরাজগঞ্জ শহরবাসীকে যেমন আতঙ্কিত করে তুলেছিল, দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমিও তখন কম চিন্তিত হইনি। সবার মনেই প্রশ্ন ছিল, প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ বছরের গ্যারান্টিসহ নির্মিত বাঁধটি নির্মাণের ১০ বছরের মাথায় কেন বারবার ভাঙনের কবলে পড়ছে? এ ছাড়া প্রতিবছর বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত মোটা অঙ্কের টাকা কোথায় যায়, কীভাবে ব্যয় করা হয়? এ নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটিও গঠিত হয় সে সময়। এসব তদন্ত কমিটি কর্তৃক বাঁধের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, পাউবো কর্তৃপক্ষের উদাসিনতা ও সময়মতো কাজ না করা, নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন, বাঁধের ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল এবং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীশাসন না করাকে বারবার বাঁধ ভাঙনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এরই ওপর ভিত্তি করে সিরাজগঞ্জ শহর ও শহর রক্ষা বাঁধকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নদী শাসনের নাম করে শহর রক্ষা বাঁধের উজানে পাইলট ড্রেজিংয়ের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। বলা হয়, পাইলট ড্রেজিং কার্যকর হলে পরবর্তী সময়ে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের অর্থও বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু, পাইলট ড্রেজিং কতটুকু করা হয়েছিল, এর কার্যকারিতা কী ছিল, বরাদ্দকৃত টাকা কারা কীভাবে উত্তোলন করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে কোন নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাইলট

ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের প্রকল্প হাতে নেয়া হলো—এ নিয়ে সচেতন মহলে রয়ে যায় নানা প্রশ্ন, নানা জল্পনাকল্পনা। আর এ কারণেই আমার কৌতূহল হয়েছিল পাইলট ড্রেজিং সম্পর্কে তথ্য জানার।

অপরদিকে সিরাজগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগে জেলার কাজীপুর উপজেলার বাসিন্দা কে এম নুর-ই-আলম বাবুল নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কাজে যোগদানের পর থেকেই তার কার্যক্রম নিয়ে সচেতন মহলে ওঠে নানা প্রশ্ন। কার্যক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও অনিয়মসহ নানা অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। ফলে আমার মধ্যেও তার আমলে রাস্তাঘাটের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানার আগ্রহ জেগে ওঠে।

তথ্য অধিকার আইন ও আমার যোগসূত্র

দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকাতে কর্মরত থাকাকালে আমি তথ্য অধিকার আইনের ওপর এমআরডিআই কর্তৃক ইউএসএআইডি প্রগতির সহায়তায় আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। সেখানেই পরিচয় হয় সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান মুকুর ভাইয়ের সঙ্গে। সর্বদা মিষ্টভাষী ওই মানুষটির সঙ্গে বেশ সখ্য গড়ে ওঠে স্বল্প সময়ের মধ্যেই। প্রশিক্ষণের কিছুদিন পরেই আমি *ডেইলি স্টার* পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে *দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট* পত্রিকাতে স্টাফ করেস্পনডেন্ট হিসেবে যোগ দিই। তখনো মুকুর ভাই আমাকে ভোলেননি।

দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার চিফ রিপোর্টার মীর মোস্তাফিজুর রহমান ছিলেন আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, আমার গুরু এবং পথপ্রদর্শক। তিনি সব সময়ই আমার লেখাগুলোর ওপর বিশেষ নজরদারি করতেন, আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং দিক-নির্দেশনা দিতেন। আমার রিপোর্টগুলো তার কারণেই হয়তো হয়ে উঠত আরও সমৃদ্ধিশালী ও তথ্যবহুল।

মুকুর ভাই আমার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে চিফ রিপোর্টার মীর মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে আমাকে তার পরবর্তী প্রশিক্ষণগুলোর জন্য নির্বাচিত করেন। সেখান থেকে আমি শিখতে পাই, কীভাবে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে হয়, আপিল করতে হয় এবং প্রয়োজনে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হয়।

যদিও আমার পেশাগত কারণে কারেন্ট ইভেন্ট নিয়ে বেশি ছুটতে হয় এবং অধিকাংশ স্থান থেকে আমি স্বাভাবিকভাবেই তথ্য পেয়ে যাই। তবু আমার বিশ্বাস ছিল, কিছু কিছু তথ্য আমি কখনোই সহজে পাব না। কেননা আমাদের দেশ এখনো শতভাগ দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত হয়নি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা শতভাগ স্বচ্ছ হতে পারেননি। তাই কিছু কিছু বিষয় সব সময়ই অন্ধকারে থেকে যায়। আর এ কারণেই আমি বেশ কিছু তথ্য চেয়ে দুটি দপ্তরে আবেদন করেছিলাম, কেবল নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, তথ্য অধিকার আইন আদৌ কোনো কাজে আসছে কি না।

আমার অভিজ্ঞতা

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২। বেলা সাড়ে ১০টা। আমি তখন দুটি আবেদন হাতে বের হই বাসা থেকে। প্রথমে গিয়েছিলাম সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসে। খোঁজ করলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী কে এম নুর-ই-আলম বাবুল অফিসে আছেন কি না। জানলাম, তিনি সাইটে গেছেন। জানতে চাইলাম, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তাদের অফিসে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া আছে কি না, যার কাছে আমি আমার আবেদনটি জমা দিতে পারি। অফিসের সংশ্লিষ্টরা হতবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলেন, সেটা আবার কী এবং কেন? বুঝলাম, আইনটি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম আইনটা সম্পর্কে এবং আমার প্রয়োজন সম্পর্কে। তারা বললেন, স্যারের (নির্বাহী প্রকৌশলী) সঙ্গে কথা বলেন।

আমি নিরুপায় হয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীকে মোবাইলে ফোন করলাম। তিনি ফোন রিসিভ করে অনেকটা বিপাকে পড়ে গেলেন বলে মনে হলো তার কথাবার্তায়। তিনি বললেন, আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেননি এবং কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেননি অথবা আমাকেও দিতে বলেননি।

সে যা-ই হোক, আমি আমার প্রয়োজনের কথা তাকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি একপ্রকার অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো আমাকে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি আমাদের রিসিপসনে আপনার আবেদনটি জমা দিয়ে যান। পরে আমি বিষয়টি দেখব।'

তার কথামতো আমি রিসিপসনে গিয়ে আবেদনটি জমা দিয়ে তার অনুলিপিতে জমা গ্রহণের স্বীকারোক্তি লিখে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্বাক্ষর নিলাম এবং সেখান থেকে সেদিনের মতো বিদায় হলাম।

পরে আমি গিয়ে পৌছলাম শহরের রাণীগ্রাম এলাকায় স্থাপিত পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিশেষায়িত শাখা/বিআরই) অফিসে। সেখানে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম এ কারণে যে, সেখানে এই আইনের আওতায় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা আছে। জেনে ভালোই লাগল। কিন্তু গোল পাকাল অন্য সময়, যখন আমি আবেদনটি দিতে গেলাম।

ওই অফিসে উপসহকারী প্রকৌশলী আনোয়ার সাদাতকে সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া ছিল। আমি যখন তার কাছে গেলাম এবং তাকে অনুরোধ করলাম আমার আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য, তখন তিনি আবেদনটি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে চাইতে অফিস থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, এ ব্যাপারে স্যারের (নির্বাহী প্রকৌশলী) সঙ্গে কথা না বলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। এমনকি তিনি আবেদন রাখতেও পারবেন না।

আমি অনেকটা নিরুপায় হয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলাম এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আবেদনটি গ্রহণ করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি ইচ্ছা করলে তথ্য দিতেও পারেন, নাও পারেন। একপর্যায়ে তিনি তার অনুগতকে আবেদনটি গ্রহণ করতে মোবাইল ফোন মারফত নির্দেশ দিলেন এবং পরে তিনি তা গ্রহণ করলেন।

যথারীতি নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও দুটি অফিসের কারও কাছ থেকে কোনো তথ্য, কোনো পত্র বা কোনো দিক-নির্দেশনা পেলাম না। অবশেষে ২৮ মার্চ ২০১২ দুটি দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর আমি পৃথকভাবে দুটি আপিল করলাম তথ্য চেয়ে। পরবর্তী সময়ে গত ৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী কে এম নুর-ই-আলম বাবুল কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৯৪১ নম্বর স্মারকে একটি পত্র আমার হাতে এসে পৌছাল, যেখানে লেখা ছিল, 'উপরোক্ত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহার চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি তাহার ইচ্ছা মোতাবেক পদ্ধতিতে অত্র কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সওজ), প্রাক্কলন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ পূর্বক সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।'

আমি যথারীতি উল্লিখিত কর্মকর্তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলাম এবং তিনি আমাকে তার অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য নেয়ার জন্য বললেন। আমি তার দেয়া নির্ধারিত সময়ে অফিসে গিয়ে বসে থাকলাম। কিন্তু, তিনি সময়মতো অফিসে আসেননি এবং আমি ফোন করলেও ফোন রিসিভ করেননি। পরে কৌশল করে তার একজন সহকর্মীকে দিয়ে তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করালাম এবং তিনি কোথায় আছেন জানতে চাইলাম। এসব ঘটনার এক পর্যায়ে তিনি অফিসে আসতে বাধ্য হলেন এবং নানা অজুহাত দেখিয়ে তার অফিসে আসার বিলম্বের অহেতুক কল্পিত কারণ বর্ণনা করলেন।

আমি যখন আমার আবেদনে উল্লিখিত কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলো তার কাছে চাইলাম, তিনি তখন আমাকে চা-সিগারেট অফারসহ নানা তালবাহানা শুরু করলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, প্রয়োজনীয় সব তথ্য তার কাছে সংগৃহীত নেই, যে কারণে তিনি তা পুরোপুরি দিতে সক্ষম নন। তাই তিনি যাবতীয় তথ্য আমাকে পরে পিয়ন দিয়ে অথবা ডাকযোগে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে বিদায় করে দিলেন।

কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমি অদ্যাবধি (১৪ মে ২০১২) কোনো তথ্য পাইনি। একইভাবে পাউবো থেকেও আমি কোনো তথ্য বা সদুত্তর পাইনি।

অবশেষে আমি গত ২ মে ২০১২ তথ্য কমিশনার বরাবর তথ্য পেতে সহযোগিতা চেয়ে অভিযোগ দাখিল করেছি।

আমার হতাশা ও প্রত্যাশা

আমি একজন সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে যথাসময়ে তথ্য পাইনি, বরং শিকার হয়েছি নানা বিড়ম্বনার। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হবে এবং তারা কীভাবে সহজে তথ্য পাবে—এ নিয়ে আমার মধ্যে রয়েছে নানা সংশয়।

অপরদিকে আইনটির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশা রয়েছে। কারণ আইনটি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সবার পক্ষেই তথ্য জানা সহজ হবে, আইনটির সার্থকতা আসবে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে সৎ মনোভাব সৃষ্টি না হলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করা এবং তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এজন্য আমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে হতে হবে আরও সচেতন ও আন্তরিক।

পরিশিষ্ট

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কিছু প্রতিবেদন

এই উদাহরণগুলোতে কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিক নিজে আবেদন করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে নাগরিক, উন্নয়নকর্মীরা যা পেয়েছেন, সাংবাদিক তা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ভারতের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মিল রয়েছে বিধায় এখানে উদাহরণগুলো সব ভারতীয় পত্রিকা থেকে নেয়া।

১. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস রিপোর্ট : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির ভ্রমণের থেকে হেলিকপ্টারের ভ্রমণব্যয় অবিশ্বাস্য রকমের কম। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* এ মন্ত্রীর ভ্রমণব্যয় চাইলে ভাউচারে এ ধরনের ভুল ও মিসলিডিং তথ্য বেরিয়ে আসে। ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তার অফিশিয়াল ভ্রমণে মোট ব্যয় ৪১,২০,৪৫৯.০০ ভারতীয় রুপি। তার মধ্যে তিনি ১৩৮ বার হেলিকপ্টার, ২২৪ বার এয়ারক্রাফট ও ১৩৫ বার গাড়ি এবং ৩৩ বার ট্রেনে ভ্রমণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ভাউচার মতে তিনি যেখানে ১০০ রুপি গাড়িভাড়া দিয়েছেন, সেখানে ফিরতি পথে মাত্র ৩৫ রুপি হেলিকপ্টার ভাড়া দিয়েছেন। অথচ পরেই মাত্র ৩৫ কিলোমিটার রাস্তার জন্য তিনি ৮০০ রুপি ভাড়া দিয়েছেন। এমন অনেক অসংলগ্নতা দেখা যায়। অথচ ডেকান এভিয়েশন জানিয়েছে, শুধু ল্যান্ডিংয়ের জন্য তাদের ন্যূনতম চার্জ ৮০০০ রুপি।

এ রকম অনেক তথ্য আমাদের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্টে আছে, যা ধরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে চমৎকার সব প্রতিবেদন করা সম্ভব।

২. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস রিপোর্ট : ভারতের নয়াদিল্লিতে একজন নারী, যিনি একটি মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি তার ভর্তি, পরবর্তী সময়ে তার ডাক্তারি পরীক্ষা ও ভর্তির কারণ-সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে ওই হাসপাতালে আবেদন করেন। আমাদের দেশের মতো ভারতীয় আইনেও ডাক্তারের কাছে রোগীর তথ্য[২৮] একটি গোপনীয় তথ্য, যা তথ্য অধিকার আইনের বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের আওতায় পড়ে। পরে ওই নারী কমিশনে অভিযোগ করলে প্রধান তথ্য কমিশনার পুরো বিষয়টি অনুসন্ধান করে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। বিষয়টি এ নারীর স্বামী তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করান এবং তিনি মনে করেন, ওই নারী একজন মানসিক রোগী, যা তিনি প্রকৃতপক্ষে নন। ওই নারীকে হাসপাতাল থেকে চার দিন পরেই রিলিজ করে দেয়া হয় এবং তার স্বামীও ওই হাসপাতালে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন, কেন তার অনুমতি না নিয়ে রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হলো। ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ না মেনে কোনো পক্ষেরই কোনো উত্তর না দিয়ে হাইকোর্টে রিট করেন। দিল্লি হাইকোর্ট ওই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

---

[২৮] তথ্য অধিকার আইন ধারা ৭ (দ)- কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত তথ্য গোপনীয় তথ্য। ভারতের আইনের ক্ষেত্রেও একই

তথ্য অধিকার আইন আসলে জনগণের আইন, এ রকম অসংখ্য উদাহরণ ভারতে সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের দেশে হয়তো এখনো সেভাবে শুরু হয়নি, আর এ লক্ষ্যেই সুশীল সমাজের প্রতিনিধি যেসব বেসরকারি সংগঠন কাজ করছে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের অনেক দায়িত্ব এখনো রয়েছে আইনটিকে প্রচারে নিয়ে আসার।

৩. দি টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট : একজন নারী ভ্রূণ নির্ধারণ পরীক্ষার পর ছয়বার গর্ভপাত করতে বাধ্য হন তার শ্বশুরবাড়ির নির্দেশের কারণে। শেষবার একটি স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে তিনি যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভপাত করেছেন সেই কেন্দ্রসহ আরও দুটি কেন্দ্রের রোগীদের রেজিস্টার এবং গর্ভপাত করানো হয়েছে, এমন রোগীদের তালিকা তথ্য অধিকার আইনের অধীনে দেখতে চান। সেসব রেকর্ডে দেখা যায়, সেখানে কোথাও তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়নি, এমনকি যে কাগজপত্রে গর্ভপাতের আগে বন্ড দিতে হয়েছে, সে কাগজেও তার স্বাক্ষর নেই। ভারতের Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act অনুযায়ী অবৈধ গর্ভপাত ও ভ্রূণের লিঙ্গ শনাক্তকরণ অবৈধ। আইনে থাকার পরও তার নাম সরকারি খাতায় কোনোভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। ডাক্তারের বিলই ছিল একমাত্র প্রমাণ তার পক্ষে, পরে এ ব্যাপারে মামলা হলে অভিযুক্ত দুই ডাক্তারের লাইসেন্স বাতিল হয়।

৪. এনডিটিভি, ইকোনমিক টাইমস্ (২৫ মার্চ ২০১২) : ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের বিদেশ ভ্রমণ বিল ২০৫ কোটি রুপি অতিক্রম করেছে—একের অধিক তথ্য আবেদন করে এ তথ্য প্রকাশ করেছে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। দীর্ঘ তিন বছর ধরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জুলাই ২০০৭ থেকে ২২টি দেশে ১২টি ভ্রমণে এই খরচ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনেক বেশি অনীহা ও দীর্ঘসূত্রিতা ছিল। তবুও তিন বছর ধরে লেগে থেকে এ তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়।

৫. ডেইলি নিউজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস (বেঙ্গালুরুর নিউজ এজেন্সি) : বেঙ্গালুরুর কিশোর সংশোধনাগারের তথ্য আবেদনের ভিত্তিতে প্রকাশিত তথ্য ছিল বেদনাদায়ক। অনেক মেয়ে শিশুকে ছেলেদের হোমে রাখা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোর কোনো মনিটরিং ছিল না। ১৪ বছরের নিচের অনেক শিশু এখান থেকে হারিয়ে গেছে, যার কোনো হদিস কেউ জানে না। সঠিক মনিটরিং না থাকার কারণে এখানে তারা আরও বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। কোনো কোনো শিশু আত্মহত্যাও করে।

৬. টাইমস অব ইন্ডিয়া : সরকারি কলেজে কোনো ইঞ্জিনিয়ার চাকরি পাবে না, যারা যেকোনো একটি সেমিস্টারে একটি বিষয়েও অকৃতকার্য হয়। এ সিদ্ধান্ত হয় জয়পুরে। একজন তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জানতে চান, সাতটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নীতি সম্পর্কে দেখা যায় যে এমনও অনেক ছাত্র আছেন, প্রথম সেমিস্টারে অকৃতকার্য হয়ে সেই সেমিস্টারের পরীক্ষা চতুর্থ সেমিস্টারে দিচ্ছেন এবং বেশি নম্বর পাচ্ছেন। অন্যদিকে এটা অন্য ছাত্রদের জন্য অন্যায়, যারা একটি সেমিস্টারে সব বিষয়ে পাস করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। এ বিষয়টি প্রমাণসহ উপস্থাপনের পর এ সিদ্ধান্ত হয়।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কিছু আপিল কর্তৃপক্ষের তালিকা

জেলা পর্যায়ে আপিল কর্তৃপক্ষের উদাহরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (জেলা পর্যায়)	আপিল কর্মকর্তা (আঞ্চলিক/বিভাগীয় অফিস)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	বিভাগীয় কমিশনার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক কার্যালয়	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	প্রধান কর্মকর্তা/অফিস প্রধান, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক উপবিভাগ	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ
সরকারি শিশু পরিবার	ডিজি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সিভিল সার্জন অফিস	বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র	চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট, বন বিভাগ
বিটিসিএল	বিভাগীয় প্রকৌশলী দপ্তর
তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা সমবায় কার্যালয়	বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ... বিভাগ
জেলা সদর হাসপাতাল	উপপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ... বিভাগ
জেলা সঞ্চয় কার্যালয়	উপপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়
জেলা শিক্ষা কার্যালয়	আঞ্চলিক উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	মহাপরিচালক, বিভাগীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
জেলা পরিষদ	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়	উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়
জেলা ত্রাণ কার্যালয়	জেলা প্রশাসক/মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
জেলা তথ্য অফিস	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা (বিভাগীয় তথ্য অফিস)
জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	উপপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
জেলা সদর হাসপাতাল	উপপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মেডিকেল কলেজ	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সরকারি কলেজ	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বিশ্ববিদ্যালয়	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
জেলা ক্রীড়া অফিস	বিভাগীয় ক্রীড়া কার্যালয়, ক্রীড়া পরিদপ্তর
জেলা কারাগার	কারা মহাপরিদর্শক, ঢাকা
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত উপবিভাগ (ইলেকট্রিক্যাল)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ (ইলেকট্রিক্যাল)

উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত উপবিভাগ (সিভিল)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ (সিভিল)
উপবিভাগীয় প্রকৌশলীর দপ্তর, পওর	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, পওর
উপপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উপ-কর কমিশনারের কার্যালয়	কর কমিশনার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়	উপনির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়
জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড (জোন অফিস)
ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয়	পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয় কেন্দ্রীয় সার্কেল
রূপালী ব্যাংক	রূপালী ব্যাংক (জোনাল অফিস)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	আঞ্চলিক, খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
স্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
খামার ব্যবস্থাপকের কার্যালয়	উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর .... বিভাগ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর .... বিভাগ
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক) শিল্পসহায়ক কেন্দ্র	চেয়ারম্যান, বিসিক
বিআরডিবি, জেলা দপ্তর	মহাপরিচালক, বিআরডিবি
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশান উপপরিচালকের কার্যালয়	উপপরিচালকের কার্যালয়
জেলা মার্কেটিং অফিস, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়	আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপ-অঞ্চল
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	বস্ত্র দপ্তর
মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র	পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	মহাপরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম	মহাপরিচালক, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর
হর্টিকালচার সেন্টার	আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন
উপপরিচালকের (আলুবীজ) কার্যালয়, হিমাগার	আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শকের কার্যালয়	প্রধান পরিদর্শন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শকের কার্যালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	চিফ ইনস্ট্রাক্টর অব ফরেস্ট, বন বিভাগ
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয়) ঢাকা
পর্যটন মোটেল	চেয়ারম্যান, পর্যটন মন্ত্রণালয়
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আঞ্চলিক কার্যালয়	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা

উপজেলা পর্যায়ে কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপজেলা পর্যায়)	**আপিল কর্মকর্তা (জেলা পর্যায়)**
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আঞ্চলিক কার্যালয়
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	সিভিল সার্জন অফিস
উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, উপজেলা শাখা	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক কার্যালয়
উপজেলা ভূমি অফিস	উপজেলা নির্বাহী অফিস
পৌর ভূমি অফিস	উপজেলা ভূমি অফিস
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	উপজেলা ভূমি অফিস
ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
উপজেলা সমবায় অফিস	জেলা সমবায় অফিস
উপজেলা নির্বাহী অফিস	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	জেলা যুব উন্নয়ন
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়
উপজেলা মৎস্য কার্যালয়	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়	জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়	জেলা নির্বাচন কার্যালয়
উপজেলা সমাজসেবা	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সিভিল সার্জন
উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসার	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস	জেলা রেজিস্ট্রার অফিস
উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়
উপজেলা মহিলাবিষয়ক কার্যালয়	জেলা মহিলাবিষয়ক কার্যালয়
উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়

কর্মসূচি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের তালিকা

কর্মসূচি	কর্তৃপক্ষের নাম
ভিজিডি	**জেলা :** জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর
ভিজিএফ	**জেলা :** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার দপ্তর **উপজেলা :** উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত	**জেলা :** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** ভূমি মন্ত্রণালয়
বিধবা ভাতা	**জেলা :** জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা মহিলাবিষয়ক **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর
বয়স্ক ভাতা	**জেলা :** সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা সমাজসেবা **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর
বীজ, সার ভর্তুকি/কৃষি ভর্তুকি	**জেলা :** কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি উপকরণ বিতরণ	**জেলা :** কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** কৃষি মন্ত্রণালয়
টেস্ট রিলিফ	**জেলা :** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার দপ্তর **উপজেলা :** উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** খাদ্য ও দুর্যোগবিষয়ক মন্ত্রণালয়

কাজের বিনিময়ে খাদ্য	**জেলা :** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার দপ্তর **উপজেলা :** উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
উপবৃত্তি (মাধ্যমিক)	**জেলা :** জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা (প্রাথমিক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক)
প্রতিবন্ধী ভাতা	**জেলা :** সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা সমাজসেবা **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর
অতিদ্ররিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি	**জেলা :** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার দপ্তর **উপজেলা :** উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** খাদ্য ও দুর্যোগবিষয়ক মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল সার্ভিস	**জেলা :** জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর **উপজেলা :** উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
আইনগত সহায়তা	**জেলা :** জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** আইন মন্ত্রণালয়
বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা	**জেলা :** সিভিল সার্জনের কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কমপ্লেক্স **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
পরিবার পরিকল্পনা সেবা	**জেলা :** উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা **উপজেলা :** উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
রাস্তা মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ	**জেলা :** সড়ক ও জনপথ বিভাগ/সিটি করপোরেশন/এলজিইডি **উপজেলা :** এলজিইডি/পৌরসভা **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** সড়ক ও জনপথ বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থাপনা	**জেলা :** গণপূর্ত বিভাগ **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** প্রশাসনিক প্রধান, গণপূর্ত অধিদপ্তর
মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	**জেলা :** জেলা মৎস্য কার্যালয় **উপজেলা :** উপজেলা মৎস্য অফিস **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** মৎস্য অধিদপ্তর
নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	**জেলা :** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড **উপজেলা :** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর :** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২২, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে জুন, ২০১১/৮ই আষাঢ়, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২১শে জুন, ২০১১ (৭ই আষাঢ়, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ৭ নং আইন

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন **জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থে কোন সংস্থার প্রধান বা উক্ত সংস্থার সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন কার্যালয় এর প্রধান বা প্রধান নির্বাহী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা পদধারীগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা ঃ—

(ক) সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্ট;

(খ) সংসদ সদস্যের ক্ষেত্রে, স্পীকার;

(গ) বিচার কর্ম বিভাগের কোন সদস্যের ক্ষেত্রে, সুপ্রীম কোর্ট এর রেজিস্ট্রার;

(ঘ) দুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, দুর্নীতি দমন কমিশন;

(ঙ) সরকারি অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; এবং

(চ) অবৈধ বা অনৈতিক কার্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(২) **"কর্মকর্তা"** অর্থে কোন সংস্থায় নির্বাচিত, মনোনীত, চুক্তিভিত্তিক বা সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন এমন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩) **"জনস্বার্থ"** অর্থ সরকার বা সরকারের নির্দেশে জনগণ বা জনগণের কিয়দংশের স্বার্থে বা কল্যাণে গৃহীত কর্ম;

(৪) **"জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য"** বা **"তথ্য"** অর্থ কোন সংস্থার এইরূপ কোন তথ্য যাহাতে প্রকাশ পায় যে, কোন কর্মকর্তা—

(ক) সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়;

(খ) সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা;

(গ) সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয়;

(ঘ) ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা (maladministration);

(ঙ) ফৌজদারী অপরাধ বা বেআইনী বা অবৈধ কার্য সম্পাদন;

(চ) জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ কোন কার্যকলাপ; অথবা

(ছ) দুর্নীতি—

এর সহিত জড়িত ছিলেন, আছেন বা হইতে পারেন;

[ব্যাখ্যা ঃ এই দফায় "দুর্নীতি" বলিতে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 161 এ 'gratification' যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।]

(৫) **"তথ্য প্রকাশকারী"** অর্থ যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করেন;

(৬) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৮) **"সংস্থা"** অর্থ—

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার (Rules of Business) অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(গ) কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ছ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(জ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ।**—(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, যুক্তিযুক্ত বিবেচনায়, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন তথ্য প্রকাশকারী, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে তথ্যটি সত্য; বা

(খ) তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলেও তিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, তথ্যটি সত্য হইতে পারে এবং তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উহার সত্যতা যাচাই করা সমীচীন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন তথ্য, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, লিখিতভাবে সরাসরি হাতে হাতে, ডাকযোগে বা যে কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা যাইবে।

(৪) প্রকাশিত প্রত্যকটি তথ্য, প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় এইরূপ সহায়ক দলিলাদি বা উপকরণ দ্বারা, যদি থাকে, সমর্থিত (supported) হইতে হইবে।

৫। **তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা।**—(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন সঠিক তথ্য প্রকাশ করিলে, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত, তাহার পরিচিতি প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশের কারণে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোন বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৩) তথ্য প্রকাশকারী কোন চাকুরীজীবী হইলে শুধু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের কারণে তাহাকে পদাবনতি, হয়রানিমূলক বদলী বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা বা এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহা তাহার জন্য মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক সুনামের জন্য ক্ষতিকর হয় বা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ৪ এর অধীন প্রকাশিত তথ্য কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশকারীকে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী করা যাইবে না এবং মামলার কার্যক্রমে এমন কোন কিছু প্রকাশ করা যাইবে না যাহাতে উক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশিত হয় বা হইতে পারে।

(৫) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত কোন বহি, দলিল বা কাগজপত্রে যদি এমন কিছু থাকে, যাহাতে তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে আদালত কোন ব্যক্তিকে, উক্ত বহি, দলিল বা কাগজপত্রের যে অংশে উক্তরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে সেই অংশ পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৬) এই ধারায় অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মামলার শুনানীকালে আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রকাশকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন অথবা তথ্য প্রকাশকারীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত উক্ত মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করিতে এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে ধারা ১০ এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬। **তদন্ত ও আইনানুগ কার্যক্রম।**—(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী ধারা ৪ এর অধীন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন তথ্য প্রকাশ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে অথবা বিষয়টি অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন হইলে উহা সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা হইলে বা, ক্ষেত্রমত, প্রেরণ করা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ স্বয়ং বিষয়টি তদন্ত করিতে পারিবে অথবা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি তদন্ত করাইতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন বিষয় তদন্তকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে, প্রয়োজনে, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৪) তদন্তকালে বা তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যদি দেখা যায় যে,—

(ক) প্রকৃত ঘটনা ও অভিযোগ তুচ্ছ প্রকৃতির, বিরক্তিকর এবং ভিত্তিহীন; অথবা

(খ) তদন্ত ও আইনানুগ কার্যক্রম চালাইবার মত যথেষ্ট কোন কারণ ও উপাদান বিদ্যমান নাই—

তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম বন্ধ করিবে, এবং বিষয়টি উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করা হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ উহার প্রতিবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি সত্য ও সঠিক, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোন তদন্তের ক্ষেত্রে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উহার তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে এবং নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হইলে, তৎসম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক বর্ধিত সময় মঞ্জুরের জন্য আবেদন না করিলে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। **তদন্তের ক্ষেত্রে সহায়তা।**—(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করিলে, তিনি, সংশ্লিষ্ট তথ্যের সত্যতা তদন্তের ক্ষেত্রে, পুলিশ বা অন্য যে কোন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন তথ্য প্রকাশকারীকে এইরূপ কোন তদন্তে সহায়তা করিতে বাধ্য করা যাইবে না, যাহার ফলে তাহার জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা তিনি ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, তদন্তকারী কর্মকর্তা, তদন্তের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য যে কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা প্রদান করিবে।

৮। **ফলাফল অবহিতকরণ।**—কোন তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য প্রকাশ করা হইলে, তথ্য প্রকাশকারী অনুরোধ করিলে, সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা তাহাকে, তাহার গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন রাখিয়া, অবহিত করিতে হইবে।

৯। **ধারা ৫ এর বিধান লংঘনের দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এর বিধান লংঘন করিলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধী কোন সরকারী কর্মকর্তা হইলে, তাহার বিরুদ্ধে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত দণ্ড ছাড়াও বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। **মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করিবার দণ্ড।**—(১) মিথ্যা জানিয়া বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হইয়া কোন তথ্য প্রকাশকারী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করিলে, যাহা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য নহে বা যে তথ্যের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন তদন্ত বা বিচার কার্য পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তিনি মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন তথ্য প্রকাশকারী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করিলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) তথ্য প্রকাশকারী কোন সরকারী কর্মকর্তা হইলে এবং তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করিলে তাহার বিরুদ্ধে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দণ্ড ছাড়াও বিভাগীয় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।**—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১২। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।**—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অ-আপোষযোগ্য (non-compoundable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

১৩। **অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত আদালত তদকর্তৃক ধারা ১০ এর অধীন আরোপিত অর্থদণ্ডকে, তথ্য প্রকাশকারীর দ্বারা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১৪। **পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান, ইত্যাদি।**—কোন তথ্য প্রকাশকারীর তথ্যের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন আনীত অভিযোগ বা অপরাধ আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে যথাযথ পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৬। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

তথ্য সূত্র

- তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০
- তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১
- তথ্য অধিকার চর্চা ব্যবহারিক নির্দেশনা, সিএইচআরআই, নাগরিক উদ্যোগ ২০১১
- তথ্য অধিকার কর্মীর হ্যান্ডবুক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ২০১০
- তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত তথ্যপত্র, মো. মাইনুল কবির, আইন বিশেষজ্ঞ
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধি ও প্রবিধানমালা

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; প্রস্তাবনা